অদ্বিতীয় ঘনাদা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭

দ্বিতীয় মুদ্রণ :
৭ই আশ্বিন,
১৮৮২ শকাব্দ

প্রচ্ছদসজ্জা :
ও
চিত্রাঙ্কন :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রক : শ্রীত্রিদিবেশ বসু
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

শ্রীসুকুমার দাশগুপ্ত

বন্ধুবরেষু

দাদা

দিন আর আমাদের কাটতে চায় না।

চার চারটে সুস্থ সবল জোয়ান ছোকরার পক্ষে এ খানিকটা অবিশ্বাস্য ব্যাপারই বটে।

কেন, কলকাতায় কি খেলাধুলো সব বন্ধ হ'য়ে গেছে? গড়ের মাঠ কি ভাগাভাগি ক'রে নিয়ে লোকে সেখানে দালান-কোঠা তুলেছে? ফুটবল ক্রিকেট হকি কি দেশ থেকে আইন করে তুলে দেওয়া হ'ল?

না।

তবে?

কলকাতার ছবিঘরগুলো কি সব বন্ধ? থিয়েটার বায়োস্কোপ সভাসমিতি মজলিশ কি আজ শহর থেকে উধাও?

না। তা নয়।

তবে?

কলকাতার সাঁতার, কুস্তি, বক্সিং, দৌড়-ঝাঁপ সব কি উঠে গেছে?

না। সবই আছে। শুধু ঘনাদা মেসে নেই।

সত্যিই ঘনাদা মেস থেকে চলে গেছে। একেবারে তল্পিতল্পা গুটিয়ে আমাদের হতভম্ব ক'রে চলে গেছে এবং এ পর্যন্ত আর ফিরে আসেনি।

প্রথম দিন দুয়েক আমরা তেমন গ্রাহ্য করিনি।

এ মেসের এমন মৌরসী পাট্টা ছেড়ে ঘনাদা যাবে কোথায় ? ফিরে তাঁকে আসতেই হ'বে।

কিন্তু দেখতে দেখতে দু-দশ দিনের জায়গায় দু-চার মাস কেটে গেছে, এখন প্রায় বছর ঘুরতে যায়, তবু ঘনাদার ফেরবার নাম নেই।

প্রথম বিস্মিত থেকে আমরা চিন্তিত হয়েছি, তারপর ব্যাকুল হয়ে খোঁজ-খবর করেছি এবং শেষে এখন তাঁর ফেরবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে হতাশ হ'য়ে শিবুর উপর খাপ্পা হ'য়ে উঠেছি।

কারণ ঘনাদাকে মেস-ছাড়া করবার মূলে যদি কেউ থাকে ত' সে শিবু।

কি দরকার ছিল বাপু সেই টুপির কথাটা তোলবার ?

টেনসিং নোরকে হিলেরীর সঙ্গে এভারেস্ট চূড়া জয় করেছেন—সকালের কাগজে খবরটা পড়ে, বসবার ঘরে আমরা গুলতানি করছি, এমন সময় ঘনাদা তাঁর টঙের ঘর থেকে নেমে এলেন।

"কি ব্যাপার হে, এত হৈ-চৈ কিসের !" ঘনাদা তাঁর আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে শিশিরের দিকে হাত বাড়ালেন।

শিশির কৌটো খুলে তাকে সিগারেট এগিয়ে দিচ্ছে যথারীতি, হঠাৎ বলে উঠল,—"ব্যাপার গুরুতর ঘনাদা। খবরের কাগজে এখুনি একটা প্রতিবাদ পাঠাতে হবে।"

"প্রতিবাদ ! কেন হে ?"—ঘনাদা সিগারেটটা তখন ধরাচ্ছেন।

"প্রতিবাদ নয় !" শিবু দস্তুরমত উত্তেজিত,—"এত জালিয়াতি ! এত চুরি ! এত মানহানি !"

রহস্যটা আমরাও তখন ধরতে পারিনি। ঘনাদা সিগারেটে প্রথম টানটা দিয়ে এতক্ষণে একটু কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "মানহানি আবার কার ?"

"আপনার !" শিবু বোমাটি ছাড়লো।

"আমার !" ঘনাদার সিগারেটে দ্বিতীয় টানটা ভালো করে দেওয়া হ'ল না।

"হ্যাঁ, আপনার! আমরা প্রতিবাদ করব, নালিশ করব, খেসারত আদায় করব"—শিবু ঝড়ের মত বলে চ'লল,—"বলে কিনা এভারেস্টে উঠেছে!"

ব্যাপারটা এতক্ষণে আমরা বুঝেছি এবং ঘনাদাকে আড়চোখে দেখে নিয়ে তৈরিও হয়েছি।

গৌরই বোকা সেজে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কি বলতে চাও এভারেস্টে এরা ওঠেনি?"

"আলবত তাই বলতে চাই।" শিবু নিজের বাঁ হাতের চেটোর উপরই ডান হাতে ঘুঁষি মারল।

"তোমার এ রকমের সন্দেহের কারণ?" শিশির গম্ভীরভাবে শুধোলে।

"কারণ?" শিবু নাটকীয়ভাবে সকলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, "কারণ, টুপি।"

"টুপি!" আমরা যেন আকাশ থেকে পড়লাম।

"হ্যাঁ, ঘনাদার টুপি!" শিবু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলে, "এভারেস্টে উঠলে সে টুপি পেত না? আর সে টুপি পেলে এভারেস্টে প্রথম ওঠবার বাহাদুরি আর ক'রত!"

"ঠিক! ঠিক!" আমরা সবাই সায় দিলাম. "কাগজে এখুনি ঘনাদার নাম দিয়ে একটা চিঠি পাঠাতে হবে। আমরাই লিখে দিচ্ছি, ঘনাদাব শুধু একটা সই!"

ঘনাদার সিগারেটে তৃতীয় টান আর দেওয়া হল না। তিনি আরাম-কেদারা থেকে কি একটা কাজের নাম করে উঠে পড়লেন। সেই যে উঠে বেরিয়ে গেলেন আর যে ফিরবেন কখন কি জানি।

ঘনাদার অভাবে মেস আমাদের অন্ধকার।

আড্ডায় এসে আমরা বসি, বিরস মুখে এক এক করে, আবার উঠে যাই। কিছুই আর জমে না।

হঠাৎ সেদিন সন্ধ্যায় এই ঢিমে আসর একটু চঞ্চল হয়ে

উঠল। ঘনাদার তেতালার ঘরখানা এ পর্যন্ত খালিই আছে। প্রথম নিজেদের গরজে আমরা কাউকে সেখানে ঢুকতে দিইনি।

কিন্তু গত দু-এক মাস ধরে মেসের অন্য বোর্ডারদের মুখ চেয়ে নিজেদের জেদ ছেড়ে দিতে হয়েছে। ঘনাদার আসবার কোন ভরসাই নাই। মেসের ক্ষতি করে কতদিন একটা ঘর আটকে রাখা যায়? এখনো কেউ ঘর দখল করেনি, তবে লোকে আসা-যাওয়া করছে।

কিন্তু হঠাৎ ওপরের সেই ঘরে কিসের শব্দ? জিনিসপত্র নাড়ার না? পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ির পর শিবুই আগে বারান্দায় গিয়ে একবার উঁকি দিয়ে এল। হ্যাঁ, ওপরের ঘরে আলো জ্বলছে।—

কাউকে আর কিছু বলতে হল না। হুড়মুড় করে সবাই একসঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে গিয়ে উঠলাম।

ঢোকবার আগেই ঘরের ভেতর থেকে ডাক এল,—"আসুন আসুন!"

ঘরের চৌকাঠেই থমকে দাঁড়ালাম সবাই। ইনি ত ঘনাদা নন!

"আসুন আসুন, ভেতরে আসুন"—ভদ্রলোক অমায়িক। ঘনাদা রোগা লম্বা শুকনো, ইনি মোটা বেঁটে এবং দিব্য গোলগাল। কিন্তু তবু কোথায় যেন মিল আছে! সে মিল ভালো করেই কিছুক্ষণ পরে টের পেলুম, কিন্তু তখন দরজায় আমাদেব অবস্থা না যযৌ ন তস্থৌ।

আমতা আমতা করে বললাম, "না, ভেতরে আর যাব না। আমরা আসি।"

"আসবেন কি! বিলক্ষণ! ছুটোছুটি করে এসে দরজা থেকেই ফিরে যাবেন!"

ব্যাপারটা একটু বিসদৃশই বটে। এসে যদি চলে যাই তাহলে এত হন্তদন্ত হয়ে আসবার মানেটা কি! তবু কাচুমাচু হয়ে বোঝাবার একটু চেষ্টা কবলাম—"না, মানে আমরা ভেবেছিলাম—আমাদের ঘনাদা এঘরে থাকতেন কিনা!"

"ঘনাদা!"—ভদ্রলোক যেন চিন্তিত।

আমরা বুঝিয়ে বললাম,—"হাঁ, নাম ঘনশ্যাম দাস। এই মেসে অনেকদিন ধরে ছিলেন কিনা……"

হঠাৎ হো হো হাসিতে আমরা চমকে উঠলাম।

ভদ্রলোক বেশ কিছুক্ষণ হেসে নিয়ে তারপর বললেন,—"ঘণ্টা!"

"ঘণ্টা!" আমরা তাজ্জব।

"হাঁ হাঁ, আমাদের ঘণ্টা!" ভদ্রলোক এবার আরো একটু বিশদ হলেন,—"আপনারা যাকে ঘনাদা বলতেন, সে-ই হ'ল আমাদের ঘণ্টা। হাঁ মনে পড়েছে বটে, ঘণ্টা এই রকম একটা মেসে কোথায় থাকত বলেছিল। তার গল্প-টল্পও তুচারটে শুনেছি।"

"আপনি ঘনাদাকে চিনতেন?" আমরা উদগ্রীব।

"চিনতাম বৈ কি!" ভদ্রলোক হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন,—"কিন্তু ঘণ্টা ত আর ফিরবে না।"

"ফিরবে না! কেন?" আমরা ঘরের ভিতর তখন ঢুকে পড়েছি।

"কানের প্লাগ খুলে গেল যে!"

"কানের প্লাগ!" খালি তক্তপোশটায় কখন সবাই বসে পড়েছি টেরও পাই নাই। ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করলাম,—"কানের প্লাগ খুলে গেল মানে!"

"মানে? মানে বোঝাতে অনেক দূর যেতে হবে।" ভদ্রলোক চিবুক ও বুকের মাঝে প্রায় অদৃশ্য গলাটায় হাত বুলিয়ে কড়িকাঠের দিকে মুখ তুলে অনেক দূরেই যেন দৃষ্টি মেলে শুরু করলেন,—"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। এদিকে ইংরেজ মার্কিন ওদিকে রুশ, কে আগে বার্লিন দখল করবে, তার পাল্লায় রুশদের জিত হয়েছে। বার্লিন একটা ধ্বংস-পুরী। ইংরেজ মার্কিনের বোমা আর রুশদের গোলায় শহর গুঁড়ো হয়ে যে ধুলো উড়েছে আকাশে, তাই তখনও থিতোয়নি। দিনের বেলাতেই যেন ঝাপসা কুয়াশায় অন্ধকার। ভয়ে ভয়ে পথ চলতে হয়, কোথাও কোন নড়বড়ে ছাদ কি দেয়াল মাথায় ভেঙে পড়ে তার ঠিক নেই।

কাইজার উইলহেল্মস্ট্রাস—চমকে উঠবেন না, ওটা রাস্তার নাম—তা থেকে বেঁকে একটা সরু গলি রাস্তায় চলেছি সেদিন, এমন সময় চমকে উঠলাম!

"দাদা!"

কাতর ডাকটা আমার পেছন থেকেই, কিন্তু চমকালাম—আওয়াজ শুনে নয়, এই দাঁতভাঙা ভাষার দেশে "দাদা" ব'লে বাংলায় কে ডাকতে পারে তাই ভেবে।—

ফিরে তাকিয়ে দেখি আমাদের ঘণ্টা। অকাজে বোপোট জায়গায় বেঘোরে পড়তে তার জুড়ি নাই! বিরক্ত হয়েই বললাম,—"তুমি আবার এখানে কোথা থেকে হে!"

ঘণ্টা ছুটে এসে আমার হাত দুটো বাড়িয়ে ধরে বললে,—"সব কথা পরে বলব দাদা, এখন আমায় বাঁচাও !"

"দিব্যি বেঁচেই ত আছো দেখছি, বাঁচাবো আর কি ?" ব'লে বিদ্রূপ করে আবার মায়াও হ'ল একটু। বললাম,—"কি ফ্যাসাদ আবার বাধিয়েছ শুনি।"

ঘণ্টা কিছু বলবার আগেই, হঠাৎ বড় রাস্তার দিকে মেশিন-গান পট্‌পটিয়ে উঠল। চোখের পলক পড়তে না পড়তে ঘণ্টা আর সেখানে নাই। এক দৌড়ে রাস্তার ধারে এক বোমা-ভাঙা বাড়ির শুকনো এক চৌবাচ্চায় গিয়ে তখন সেঁধিয়েছে। সেখানে গিয়ে ধরতেই কাঁপতে কাঁপতে বললে,—"ফ্যাসাদ দাদা ওই !"—

অবাক হ'য়ে বললাম,—"আরে, ও ত' বেওয়ারিশ বাড়ি-ঘর পেয়ে যুদ্ধের গোলমালে যারা লুটপাটের ফিকিরে আছে, তাদের রুশ শান্ত্রীরা গুলি করছে।—তোমার ওতে ভয়টা কিসের ?"

"ভয়টা কিসের ত' ব'লে দিলে। আমার চেহারাটা কি লুটেরার বদলে দেবদূতের মত যে, সান্ত্রীরা আমায় ছেড়ে কথা কইবে ?"—

ঘণ্টার কাঁদুনি শুনে হাসিই পেল একটু, বললাম—"চেহারা তোমার যাই হোক না, মিলিটারী পাস ত' আছে।"

"হাঁ, মিলিটারী পাস ! আমি কি রুশভেল্ট চার্চিলের ইয়ার, না স্টালিনের দোস্ত যে মিলিটারী পাস পাব। প্রাণটা নিয়ে ইঁদুরের মত এই কদিন বার্লিন শহরে লুকোবার গর্ত খুঁজে ছুটোছুটি করছি। কখন ধরা পড়ি কে জানে ?"

এবার পিঠ চাপড়ে তাকে সাহস দিয়ে বললাম—"আচ্ছা ভয় নাই, মিলিটারী পাসের ব্যবস্থা তোমায় করে দেব।—কিন্তু মরতে এই শহরে এমন সময় কেন এসেছিলে বলত ?"

ভরসা পেয়ে ঘণ্টা তখন একটু চাঙ্গা হয়েছে। বললে,—"বেশী কিছু নয়, দাদা, একটা হিসাবের কল। তার একটা শুলুক-সন্ধান নিয়ে যেতে পারলেই মোটা বকশিশ পেতাম। কিন্তু কারিগর

সমেত সে কল এখন রুশদের গোলায় কোন্ পাতালে চাপা পড়েছে কে জানে!”

না হেসে আর পারলাম না। বললাম, “সাগর ডিঙোতে তোমার মত ব্যাংকে যারা পাঠিয়েছে, তাদেরও বলিহারি! আরে, ওটা সামান্য হিসাবের কল নয়, পৃথিবীর “অষ্টম আশ্চর্য” ইলেকট্রোনিক ব্রেন, আর ও যন্ত্র যিনি তৈরি করে বিজ্ঞানের জগতে যুগান্তর এনেছেন, তাঁর নাম হ'ল ডাঃ বেনার। ওদিকে মিত্রশক্তি আর এদিকে রাশিয়া তাঁকে পাবার জন্যে অর্ধেক রাজত্ব এখুনি দিতে প্রস্তুত।—কিন্তু পাবে কোথায়? সে গুড়ে বালি! ডাঃ বেনার মারাও যাননি, তাঁর যন্ত্রও কোথাও চাপা পড়েনি। মিত্রশক্তি যেদিন নরম্যাণ্ডির কূলে নেমেছে, তিনটে “স্পরকেল সাবমেরিনে তাঁর যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম চড়িয়ে সেইদিনই তিনি উধাও।—”

হতভম্ব হয়ে ঘণ্টা এবার শুধোলে—“এত কথা তুমি জানলে কি করে, দাদা?”

কি আর উত্তর দেব। হেসে বললাম,—“এই বার্লিন শহরে ঘাস কাটতে কি অলিগলি ঘুরে বেড়াচ্ছি মনে করো?”
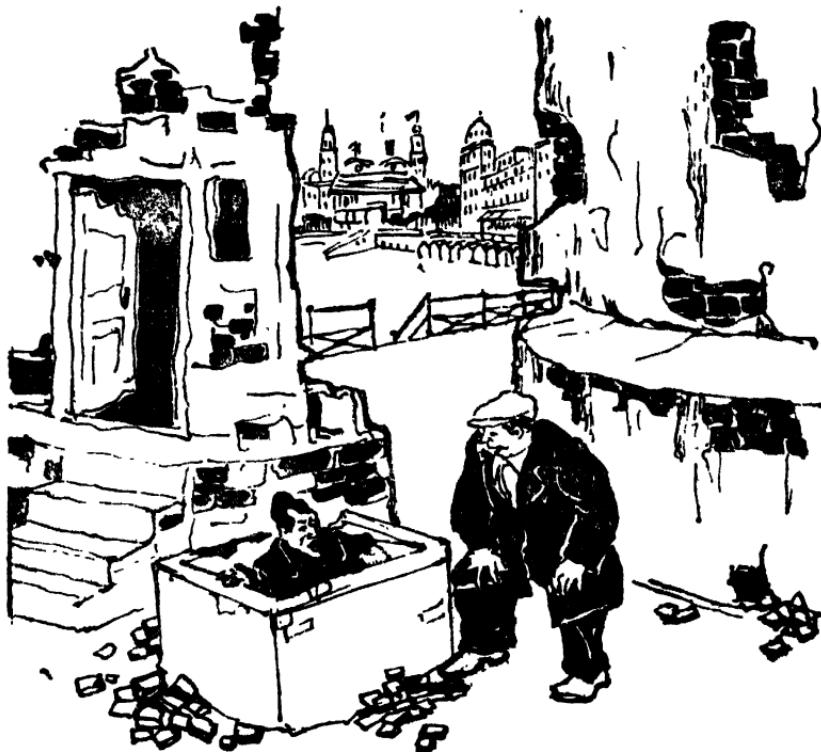
ঘনাদার দাদা সত্যিই একটু হেসে এবার থামলেন। বদ অভ্যাস যাবে কোথায়? শিশির সিগারেটের টিনটা আপনা থেকেই তখন বাড়িয়ে দিয়েছে। দাদা কিন্তু সেটিকে মোলায়েমভাবে প্রত্যাখ্যান করে প্রকাণ্ড এক ডিবে থেকে সশব্দে এক টিপ নস্যি নিয়ে নাক মুছলেন।

“ডাঃ বেনারকে তারপর আর পাওয়া গেছে?”—গৌরের আর তর সইছে না। আমাদেরও অবশ্য তাই।

“বলছি, সবই বলছি। কিন্তু তার আগে ডাঃ বেনারের যন্ত্রটার একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। বড় বড় অফিসের ক্যালকুলেটিং মেশিন দেখেছেন, দুঘণ্টার অঙ্ক দু সেকেণ্ডে সব কষে দেয়? গাঁয়ের কামারশালের সঙ্গে টাটার কারখানার যা তফাত, এই ক্যালকুলেটিং মেশিনের সঙ্গে ডাঃ বেনারের ইলেক্ট্রোনিক ব্রেনের তাই। সাত

সাতটা অঙ্কের শুভঙ্কর সাত বছরে যে অঙ্কের শেষ পায় না, ভূতুড়ে যন্ত্র তা সাত সেকেণ্ডে কষে দিতে ত' পারেই, তা ছাড়া কি যে পারে না—তাই বলাই শক্ত। মিত্রশক্তি আর রাশিয়া হন্যে হয়ে ডাঃ বেনারকে এই জন্যেই খুঁজেছে। বিজ্ঞানের যত আশ্চর্য আবিষ্কার, তত সূক্ষ্ম জটিল তার অঙ্ক। ডাঃ বেনারের ভূতুড়ে যন্ত্র যারা দখলে পাবে, অন্য পক্ষকে তারা পাঁচশ বছর পিছিয়ে ফেলে যেতে পারবে।

কিন্তু কোথায় ডাঃ বেনার, আর কোথায় তাঁর ভূতুড়ে কলের মাথা?

যুদ্ধ শেষ হল। গলায় গলায় যাদের ভাব, তারা আদায়-কাঁচকলায় গিয়ে পৌঁছাল। দু'দলের চর-গুপ্তচরেরা দুনিয়া তোলপাড় ক'রে ফেললে, কিন্তু ডাঃ বেনার নিপাত্তা। আতলান্তিকের তলাতেই কোথাও "স্পরকেল ডুবোজাহাজগুলি সমেত তিনি ডুবেছেন, এই ধারণাই শেষ পর্যন্ত সকলের হ'ত যদি না……"

ঘনাদার দাদা একটু থেমে—আমাদের অবস্থাটা একটু লক্ষ্য করে নিয়ে আবার শুরু করলেন,—"যদি না নরওয়ের ক'টা তিমি-ধরা জাহাজ পর পর অমন নিখোঁজ হ'ত।"

আজকালকার তিমি-ধরা জাহাজ ত' তখনকার পালতোলা মোচার খোলা নয়, সে জাহাজকে জাহাজ, আবার কারখানাকে কারখানা। আস্ত তিমি ধ'রে গালে পুরে তেল-চর্বি থেকে ছাল চামড়া হাড় মাংস সব সেখানে আলাদা ক'রে বার করবার বন্দোবস্ত আছে। তার হার্পুন কামান যেমন আছে, বেতারযন্ত্র আছে তেমনি বিপদে পড়লে খবর পাঠাবার। সেরকম জাহাজ নেহাত চুপিসাড়ে টুপ করে ডুবতে পারে না, একটু কান্নাকাটি শোনা যাবেই।

ব্যাপারটা কি জানবার জন্যে কেঁচো খুঁড়তে একেবারে গোখরোর গর্তে গিয়ে পৌঁছলাম। ব্যাফিন্ আইল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ফ্রবিশার বে, সেইখানে ছোট এক বেনামী দ্বীপ। ভাড়া-করা একটা মোটর-লঞ্চে সেখানে যখন গিয়ে উঠলাম, তখন গভীর রাত।

রাত অবশ্য সেখানে মাসখানেক ধরেই গভীর। উত্তর মেরুর কাছাকাছি জায়গা ত'! একটা দিনরাতেই প্রায় বছর কেটে যায়!

একটা সরু খাড়ির মধ্যে মোটর-লঞ্চ ঢুকিয়ে নামলাম ত' বটে, কিন্তু সেই আবছা অন্ধকারের রাজ্যে বরফ-ঢাকা পাথুরে জায়গায় দু-পা গিয়েই ঘণ্টা আর যেতে চায় না। ঘণ্টা সেই থেকে সঙ্গে আছে বলা বাহুল্য।

ঘণ্টাকে বোঝাব কি? নিজেরই তখন কেমন অস্বস্তি হচ্ছে,

ছুনিয়ার হেন বিপদ নেই যাতে পড়িনি। কিন্তু এ যেন সবকিছু থেকে আলাদা ব্যাপার! ভয়ঙ্কর একটা আতঙ্কই যেন আবছা অন্ধকার হ'য়ে চারিদিকে ছমছম করছে, আকাশ থেকে, মাটির তলা থেকে একটা বুক-গুর-গুর করা ভয়ের কাঁপুনি উঠে সমস্ত শরীর হিম ক'রে দিচ্ছে। কিন্তু তা বলে থামলে ত' চলবে না।

ঘণ্টাকে ধমক দিতে যাচ্ছি এমন সময় চীৎকার করে উঠল,—"পালাল! পালাল!"

ফিরে দেখি, সত্যি একটা আবছা মূর্তি পাথুরে একটা ঢিবির পাশ থেকে ছুটে আমাদের লঞ্চটায় গিয়ে লাফিয়ে ওঠে আর কি!

তখুনি ছুট্, খানিকটা ধস্তাধস্তি! মূর্তিটাকে কাবু করে মাটিতে ফেলতেই সে কাতরে উঠল, "ছাড়ো আমায় ছাড়ো, যদি বাঁচতে চাও ত' এখনি না পালালে নয়!"

চোস্ত জার্মান কাতরানি শুনে টর্চটা জ্বেলে তার মুখে ফেলে দেখি—একি! এ যে ডাঃ বেনার। কিম্বা তার ভূতও বলা যায়। ফ্যাকাশে মুখে যেন রক্ত নেই! শরীরে হাড়ের ওপর শুধু চামড়াটা আঁটা।

অবাক হয়ে গেলাম,—"ব্যাপার কি ডাঃ বেনার? আপনার খোঁজে যমের এই উত্তর দোরে এলুম, আর আপনি পালাচ্ছেন কেন?"

"সব বলব, আগে লঞ্চে উঠে বেরিয়ে পড়ো, তারপর।"

আমি কিন্তু নাছোড়বান্দা। সব কথা না শুনে নট্ নড়ন-চড়ন, নট্ কিচ্ছু।

নিরুপায় হয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাঃ বেনার তারপর যা বললেন তা শুনে আমরা থ'! ছুনিয়ায় এরকম তাজ্জব ব্যাপার কখনো কেউ শোনেনি, কল্পনা পর্যন্ত করেছে কিনা সন্দেহ!

ডাঃ বেনার আতলান্তিকে ডোবেননি, তিনটে সাবমেরিন নিয়ে অনেক ভেবেচিন্তে এই যমের অরুচি দ্বীপে এসে উঠেছিলেন। যে-সব লোকজন সঙ্গে এনেছিলেন তাদের দিয়ে কয়েক বছর ধরে

ধীরে ধীরে তিনি তাঁর আশ্চর্য কলের মাথা তারপর বসিয়েছেন। এমন সব উন্নতি তারপর সে কলের করেছেন, যে জার্মানীর যে যন্ত্র তখনই পৃথিবীর বিস্ময় ছিল, তা' এর কাছে ছেলেখেলা হ'য়ে গেছে। এই এক দানবীয় কলের মাথা দিয়ে সমস্ত পৃথিবী তিনি জয় করবেন, শাসন করবেন—এই তাঁর জেদ। এ কলের মাথা শুধু অঙ্ক কষে না, ভাবে, আর যে-কোন বিষয়ে ভেবে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছায় তা নির্ভুল। পৃথিবীর সব দিকের সমস্ত বৈজ্ঞানিকের মাথা একত্র করলেও এর তুলনায় তা সমুদ্রের কাছে ডোবা। সৃষ্টি-রহস্যের বড় বড় কূটকচাল ত বটেই, ছোটখাট তুচ্ছ বিষয়েও তার বুদ্ধির প্যাঁচ একেবারে থ' করে দেয়। এই দানবীয় কলের মাথার পরামর্শ পেলে মানুষের সভ্যতা গরুর গাড়ীর তুলনায় একেবারে রকেটে উড়ে এগিয়ে যাবে। শুধু কটা কল টিপলেই হল। আলাদীনের পিদ্দিম এর কাছে কিছু নয়।

ডাঃ বেনার হাতে স্বর্গ পেয়ে যখন ধরাকে সরা দেখছেন, এমন সময় একদিন বিনা মেঘে বজ্র পড়েছে। ডাঃ বেনার আঁতকে উঠে একদিন টের পেয়েছেন যে, তিনি কল-কে নয়, কলই তাঁকে চালাচ্ছে!

কল টিপে ভাবালে যে ভাবত, সে যন্ত্র কেমন করে স্বাধীন হ'য়ে উঠেছে। আর সে স্বাধীনতার মানে কি? নিজের ভাবনা নিজেই শুধু ভাবে না, এমন অদৃশ্য আশ্চর্য শক্তি তার ভেতর জেগেছে যে তাই দিয়ে ধারে কাছে তুচ্ছ মানুষ যারা থাকে, তাদের একেবারে খেলার পুতুল বানিয়ে দেয়। তার সে শক্তির কাছে কারও রেহাই নাই। মানুষ তাকে দিয়ে এতদিন প্রশ্নের উত্তর জেনেছে, এখন সে মানুষকে প্রশ্ন করে তার সব-কিছু জানবে, যেমন খুশি চালাবে—এই তার দানবীয় ক্ষ্যাপামি। হাতে ছুরি পেলে দুরন্ত ছোট ছেলের যেমন সব-কিছু কেটে সুখ, এ যন্ত্রের তেমনি পৈশাচিক বিলাস—প্রশ্ন করায় আর প্রশ্ন শোনায়। সময় যেন তার কাটে না। আর কিছু যখন নেই, তখন খালি প্রশ্ন করতে হবে তাকে! প্রশ্নের পর প্রশ্ন! আর পট পট তার উত্তর দিয়ে তখুনি সে চাইবে আবার প্রশ্ন। জিজ্ঞাসা করবার মত প্রশ্ন খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে উন্মাদ হয়ে ডাঃ বেনারের সঙ্গীরা একে একে সব শেষ হয়ে গেল। কটা তিমি-ধরা জাহাজ কি কুক্ষণে এখানে এসে পড়েছিল? তাদের লোক-লস্কর সব দুদিনেই কাবার! পালাবার উপায় নাই তার হাত থেকে। অদৃশ্য অজানা শক্তিতে এ দ্বীপের দশ মাইলের মধ্যে যে কেউ আছে, তার কাছে বাঁধা। ডাঃ বেনার তাঁর জীবনের সমস্ত বিষয়ে পাণ্ডিত্য হাঁটকে কোন রকমে প্রশ্নের পর প্রশ্ন জুগিয়ে এখনো টিকে ছিলেন, কিন্তু তাঁর সমস্ত পুঁজিও শেষ। এখুনি আর রক্ষা নাই না পালালে।

সব শুনে জিজ্ঞাসা করলাম, "কিন্তু অদৃশ্য শক্তিতে যদি বাঁধা হন তা হ'লে আপনি পালাচ্ছেন কি করে? আমরাই বা কিছু বুঝতে পারছি না কেন?"

ডাঃ বেনার বললেন, "নেহাত দৈবাৎ একটা সুযোগ পেয়ে একটা তার আমি আলগা করে দিতে পেরেছি আজ। কলের মাথা তাই খানিকক্ষণের জন্যে বিকল হ'য়ে আছে। কিন্তু সে বেশীক্ষণ নয়, এখুনি হয়ত শুধরে নিয়ে চাঙ্গা হ'য়ে উঠবে।"

"তাহলে উপায় ?"

"উপায় এখুনি লঞ্চ চালিয়ে বেরিয়ে পড়া।"

"কিন্তু দশ মাইল পার হবার আগেই যদি ওই দানব জেগে উঠে!"

"তারও একটা উপায় করেছি!" ডাঃ বেনার পকেট থেকে ক'টা ছোট ইলেক্‌ট্রিক প্লাগের মত জিনিস বার করে আমাদের হাতে দিয়ে বললেন—"শীগ্‌গির এইগুলো ত্ব'কানে গুঁজে দিন। পরীক্ষা এখনো হয়নি, তবে আমার ধারণা—কলের মাথার অদৃশ্য শক্তি কানের ভেতর দিয়েই আমাদের মগজে হুকুম চালায়। আমার গোপনে তৈরী এ প্লাগ সে শক্তিকে খানিকটা ক্ষীণ করে দিতে পারবে।"

মোক্ষম সময়েই প্লাগের ঠুলি ত্বটো হাতে পেয়েছিলাম। শরীরে হেঁচকা টানে যেমন হয়, হঠাৎ মাথায় ঠিক তেমনি একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়েই বুঝলাম, দৈত্য-মাথা জেগেছেন। তৎক্ষণাৎ ঠুলি ত্বটো ত্ব'কানে গুঁজলাম। কিন্তু ঠুলিতে কি আটকায়! মনে হ'ল কে যেন আমার মগজে ভর করে প্রাণপণে আমায় কোথায় টানছে। ঠুলির দরুন টানটা একটু কম—এই যা।

পড়ি কি মরি তিনজনে লঞ্চে গিয়ে উঠে ইঞ্জিন চালিয়ে দিলাম। কানের ঠুলি যেন অদৃশ্য টানে ফেটে বেরিয়ে যাবে।

লঞ্চ তখন চলেছে এই ভাগ্যি। কিন্তু আহাম্মকের মরণ যাবে কোথায়? কানের যন্ত্রণাতেই বোধ হয় ঘণ্টা একটা কানের ঠুলি একবার একটু খুলতেই—আর দেখতে হ'ল না! 'ধর', 'ধর' করতে করতে ঘণ্টা লঞ্চ থেকে জলে লাফিয়ে পড়ল। আমাদের লঞ্চ তখন তীরবেগে বার-দরিয়ায় চলেছে। ঘণ্টার সঙ্গে সেই শেষ দেখা।"

হঠাৎ কাশির শব্দে আমরা ফিরে তাকিয়ে একেবারে থ'।

আমরা যদি থ' হয়ে থাকি ত' আমাদের নতুন দাদা একেবারে হাড়গোড় ভাঙা দ'।

কোন রকমে শুকনো গলায় ঢোঁক গিলে বললেন—“একি! ঘন্—মানে ঘনশ্যাম তুমি কি, কখন এলে ?”

ঘনাদার মুখে কোন ভাবান্তর নেই। গম্ভীরভাবে বললেন—“তা এসেছি অনেকক্ষণ।”

“কিন্তু তুমি ত'...” নতুন দাদার কথাটা আর শেষ হ'ল না।

ঘনাদা বললেন—“হ্যাঁ, অক্ষত শরীরেই ফিরে এসেছি কাজ শেষ করে।”

“কি করে ঘনাদা ? কেমন করে ?” আমরা এক সঙ্গেই বোধ হয় চেঁচিয়ে উঠলাম।

ঘরে তক্তপোশ ছাড়া আর বসবার জায়গা নেই। তারই একধারে বসে শিশিরের এগিয়ে দেওয়া টিনটা থেকে একটা সিগারেট নিয়ে হাতের ওপর ঠুকতে ঠুকতে ঘনাদা তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন—“অত অবাক হবার কি আছে! এমন শক্ত ব্যাপার ত' কিছু নয়। তাকে স্রেফ একটি প্রশ্ন গিয়ে করলাম ; ব্যস্, তাতেই খতম।”

“কি প্রশ্ন ঘনাদা ?”

ঘনাদা বললেন—“প্রশ্ন আর কি! জিজ্ঞাসা করলাম—গাছ আগে না বীজ আগে ? সে তাই ভাবছে, ভাবতে ভাবতে এতদিনে শেষও হ'য়ে গেছে বোধ হয়।”

হঠাৎ জোর করে ঘনাদার পায়ের ধুলো নিয়ে আমাদের নতুন দাদা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ফুটো

গৌর ছুটতে ছুটতে এসে যে খবরটি দিলে তাতে আমাদের চক্ষু একেবারে চড়ক গাছ !

ঘনাদা আবার বুঝি মেস্ ছেড়ে যায় !

আবার ?!?!

কি হল কি ?!

ছুটির দিন দুপুর বেলায় বসবার ঘরের মেঝেয় সবে তখন শতরঞ্জিটা পেতে তাস-জোড়া নিয়ে বসেছি। হঠাৎ এ-সংবাদে যেন যুদ্ধের সময়কার সাইরেনের আওয়াজে ধড়মড় করে উঠে পড়লাম।

প্রথম চোটটা গৌরের ওপরই গিয়ে পড়ল। শিশির ত' মারমূর্তি হ'য়ে বললে—"তুই—তুই—নিশ্চয়—তুই-ই সব নষ্টের মূল।"

"আহা আমি মূল হ'তে যাব কেন ?"—গৌর নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে ব্যস্ত হ'য়ে উঠল—"সব নষ্টের মূলে ওই ফুটো !"

"ফুটো !!"

"হ্যাঁ, দেখবেই চল না।"

আর দু'বার বসবার দরকার হ'ল না। গৌরের পিছু-পিছু সবাই ঘনাদার তেতালার ঘরে গিয়ে উঠলাম।

উঠে বুঝলাম ব্যাপারটা গুরুতর।

আমাদের এতজনকে এমন হুড়মুড় ক'রে তাঁর ঘরে ঢুকতে দেখেও ঘনাদার কোন ভাবান্তর নেই।

তিনি গম্ভীর মুখে তাঁর জিনিসপত্র গোছাতে তন্ময়।

জিনিসপত্র বলতে সাধের গড়গড়াটি বাদে একটি ছোট কম্বল জড়ানো বিছানা ও একটি পুরনো রঙচটা ঢাউস তোরঙ্গ।

এই তোরঙ্গটি আমাদের সকলেরই অত্যন্ত কৌতূহলের বস্তু। তার ভেতর কি যে আছে আর কি যে নেই, এ নিয়ে বহুদিন আমাদের অনেক গবেষণা তর্কাতর্কি হয়ে গেছে।

কারুর সামনে কোনদিন এ তোরঙ্গ খুলতে ঘনাদাকে দেখা যায়নি। নিন্দুকেরা তাই এমন কথাও বলে থাকে যে, তোরঙ্গটি ঘনাদার গল্পেরই চাক্ষুষ রূপ। ওর ভেতর থেকে ঘনাদা না বার করতে পারেন এমন জিনিস নেই, কিন্তু আসলে ওটি একেবারে ফাঁকা।

আমাদের দেখে আজকেও ঘনাদা সশব্দে তোরঙ্গের ডালাটি বন্ধ করে দিতে ভোলেন না, তারপর তাঁর সেই কম্বল জড়ানো বিছানা নিয়ে এমন ব্যস্ত হয়ে পড়েন যেন সাত রাজ্যের ধন তার মধ্যে তিনি জড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

"ব্যাপার কি ঘনাদা! এত বাঁধা-বাঁধি কিসের?"—আমাদের জিজ্ঞাসা করতেই হয়।

ঘনাদা এতক্ষণে যেন আমাদের দেখতে পান। বিছানা বাঁধা থামিয়ে একটু দুঃখের হাসি হেসে বলেন,—"আর কেন? এখানে থাকা ত চলল না!"

কেন ঘনাদা!

কি হ'ল কি?

আমাদের প্রশ্ন ব্যাকুল থেকে ব্যাকুলতর হয়ে ওঠে। শিবু উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করে,—"কালকের মাংসের চপ্‌টা কি সুবিধের হয়নি?"

গৌর তাতে রসান দিয়ে বলে,—"আজ ত' আবার গঙ্গার ইলিশ এসেছে।"

শিশির সাগ্রহে সিগারেটের টিনটা এগিয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করে,—"ভাতে, না কাঁচা ঝোল কোন্‌টা আপনার পছন্দ?"

কিন্তু ভবী আজ কিছুতেই ভোলবার নয়। গঙ্গার ইলিশের নামেও ঘনাদাকে টলান যায় না। শিশিরের সিগারেটের টিনের দিকে দৃক্‌পাত পর্যন্ত না করে তিনি ক্লান্তভাবে বলেন, "আমার পছন্দে কি যায়-আসে আর। আমি ত আর থাকছি না।"

"থাকছেন না! কেন বলুন ত! ওয়াশিংটন কি লণ্ডন থেকে জরুরী ডাক এল নাকি?"—এই সঙ্কটকালেও শিবুর মুখ ফসকে রসিকতাটা বোধ হয় বেরিয়ে যায়। আমরা কিন্তু শিবুর ওপর ক্ষেপে যাই।

"কি, পেয়েছিস কি ঘনাদাকে! হেট্‌ করে ডাকলেই অমনি উনি চলে যাবেন। সে ইডেন কি ডালেস হ'লে যেত! বলে কতদিন সাধ্য-সাধনা করেও ওঁকে নিয়ে যাওয়া যায় না! না, না, সত্যি কি ব্যাপার বলুন ত ঘনাদা?"

ঘনাদা, কেন বলা যায় না, একটু যেন প্রসন্ন হয়েছেন মনে হয়। বিছানা বাঁধার যে দড়িগাছটা এতক্ষণ ধরে—নানাভাবে নাড়াচাড়া করছিলেন সেটা ছেড়ে দিয়ে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলেন,—"কেন, সত্যি জানতে চাও?"

"চাই বই কি!"—আমরা সমস্বরে আগ্রহ জানাই।

উঠে দাঁড়িয়ে যেন কোন দারুণ রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে যাচ্ছেন এই ভাবে ঘনাদা আমাদের ইশারায় ঘরের একটা দেওয়ালের কাছে নিয়ে যান। তারপর হঠাৎ নাটকীয়ভাবে একদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেন,—"দেখো।"

গৌরের কাছে ব্যাপারটা আগে একটু জেনে তৈরি থাকলেও আমরা প্রথমটা একটু হতভম্বই হয়ে যাই।

ঘনাদার আজকাল দৃষ্টিভ্রম হচ্ছে নাকি! সাদা দেওয়ালে স্বপ্ন দেখছেন! তারপর অবশ্য ব্যাপারটা চোখে পড়ে।

মেঝে থেকে দেওয়াল যেখানে উঠেছে, সেখানে একটি কোণে একটা পেন্‌সিল গলাবার মত ছোট একটা ফুটো!

আমরা অতি কষ্টে হাসি সংবরণ করি, কিন্তু ঘনাদা যেন সহ্যের

সীমা পার হয়ে গেছেন এমনিভাবে বলেন—"এই ফাটা-ফুটো ঘরে মানুষ বাস করতে পারে?"

আঙুল গলাবার মত একটা ফুটোয় ঘরটা কেন মানুষের বাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে বুঝতে তখন আর আমাদের বাকি নেই।

অপরাধটা আমাদের সবাইকার। নিচের কলতলাটা অনেকদিন থেকেই ভেঙেচুরে গেছল। বাড়িওয়ালাকে অনেক ধবে-টরে দিনকয়েক আগে আমরা সে জায়গাটা নতুন সিমেণ্ট দিয়ে মেরামতের ব্যবস্থা করেছি।

কলতলা মেরামত দেখেই ঘনাদা আব্দার ধরেছিলেন, কলতলার সঙ্গে তাঁর ঘরটাও একবার মেরামত চুনকাম করে দিতে হবে।

আব্দারটা অন্যায়। আমরা ঘনাদাকে অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। কলতলা সারাচ্ছে বলেই হঠাৎ সমস্ত বাড়ি ছেড়ে দিয়ে তেতলার একটা কুঠুরি মেরামত করতে বাড়িওয়ালা রাজী হবে কেন? তাছাড়া সেটা কি ভালো দেখাবে! কিছুদিন বাদেই সমস্ত বাড়িটা চুনকামের সময় তাঁর ঘরটার যা করবার করা হবে।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! ঘনাদা সেদিন থেকে গুম হয়ে যা চেপে রেখেছিলেন, আজ এই ফুটো দিয়েই তা ফাটবার উপক্রম।

অবস্থা সঙীন বুঝে আমাদের বাধ্য হয়েই চাল পাল্টাতে হয়।

রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে বলি,—"আপনার ঘরের এ অবস্থা হয়েছে তা ত' জানতাম না।"

গৌর সায় দিয়ে বলে,—"না, এ ঘর এখুনি মেরামত-ব্যবস্থা করা দরকার।"

"বাড়িওয়ালা যদি রাজী না হয়, আমরা চাঁদা তুলেই আপনার ঘর মেরামত করে দেব!"—শিশির দরাজ হয়ে ওঠে।

আগুনে জল পড়ে ঘনাদা যখন প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে এসেছেন, তখন শিবুর একটি বেফাঁস কথায় আবার সব বুঝি মাটি হয়ে যায়!

"সত্যি। ফুটো বলে ফুটো!"—শিবু হঠাৎ ফোড়ন কেটে বসে—"ও ফুটো দিয়ে ঘনাদা কোন দিন গ'লে যাননি, এই আমাদের ভাগ্যি!"

ঘনাদা শিবুর দিকে ঘাড় ফেরান। সেই ঘাড় ফেরাবার ধরন আর তাঁর মুখে আষাঢ়ের মেঘের মত ছায়া দেখেই আমরা সামলাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠি।

কিন্তু সামলাব কি? হাসি চাপতে প্রায় দম ফাটার যোগাড়!

সব হাসির বেগ কিন্তু একটি কথায় ঠাণ্ডা।

"কি ফুটো জীবনে দেখেছ হে!"—ঘনাদার গলা নয় ত যেন মেঘের ডাক শোনা যায়।

আর মেঘের ডাকে চাতকের মত সব হাসি-ঠাট্টা ভুলে আমরা উৎসুক হয়ে উঠি।

"আপনি কি ফুটো দেখেছেন ঘনাদা?"

"পড়েছেন নাকি কখনো গ'লে?"

"হ্যাঁ পড়েছি!" ঘনাদা গম্ভীরমুখে আবার তাঁর বিছানায় এসে বসে বলেন, "পড়েছি চার কোটি মাইল!"

"চার কোটি মাইল একটা ফুটো!"—শিশির প্রায় উল্টে পড়ে যায় আর কি!

"পৃথিবীটা এফোঁড় ওফোঁড় করলেও ত আট হাজার মাইলের বেশী হয় না।"—গৌর হতভম্ব হয়ে নিবেদন করে।

"না, তা হয় না"—নির্বিকারভাবে ঘনাদা জানান।

"তবে···?" বলার আগেই যে যেখানে পারি আমরা বসে পড়ি। ঘনাদা শুরু করেন···

"প্যারাস্যুটটা আর যেন খুলতেই চায় না। বিশ হাজার থেকে দশ হাজার ফুট, দশ হাজার থেকে পাঁচ হাজার। পাঁচ থেকে আড়াই, আড়াই থেকে এক হাজার ফুট! তখনো ঠিক যেন ইটের বস্তার মত পড়ছি ত পড়ছি-ই!

নিচের তুষার ঢাকা পৃথিবী বিদ্যুৎবেগে আমার দিকে ছুটে

আসছে দেখতে পাচ্ছি। আর কটা সেকেণ্ড। তারপর বুঝি শরীরের গুঁড়োগুলোও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কিন্তু ঠিক পাঁচ শ' ফুটের কাছে আসলটা না হলেও এ রকম বিপদের জন্যে ফাউ-হিসাবে যে ছোট প্যারাস্যুটটা সঙ্গে থাকে, সেটা খুলে গেল ভাগ্যক্রমে! কিন্তু তা'তে কি আর পুরোপুরি সামলান যায়। ইটের বস্তার মত না হোক, বেশ সজোরেই নিচে গিয়ে পড়লাম।

কি ভাগ্যি শীতের শেষে তুষার একটু নরম হতে আরম্ভ করেছে, চোট্‌টা তাই তেমন বেশী হ'ল না।

প্যারাস্যুট গুটিয়ে নিয়ে তারপর গা থেকে খুলে অবাক হয়ে চারিদিকে চাইলাম। ধূ-ধূ করা তুষার-ঢাকা তুন্দ্রা দিগন্ত পর্যন্ত বিছানো! কিন্তু মিখায়েলের দেখা নেই কেন?

প্যারাস্যুট নিয়ে সে ত আমার আগেই ঝাঁপ দিয়েছে প্লেন থেকে। এমন কিছু দূরে ত সে নামতে পারে না যে চোখেই দেখা যাবে না!
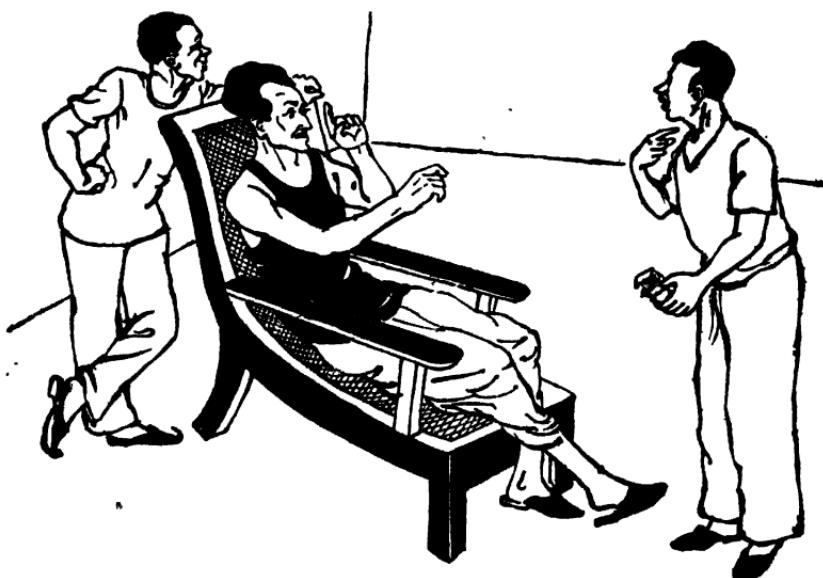
পরমুহূর্তেই রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল। মিখায়েলকে এখনো মাটির ওপর দেখব কি করে? এখনো সে ত' শূন্যলোকে।

প্যারাস্যুট না খোলার দরুন আমি যেখানে বিদ্যুৎবেগে কয়েক মুহূর্তে নেমেছি, সেখানে তার খোলা প্যারাস্যুট ধীরে-সুস্থে ভাসতে ভাসতে এখনো নামছে।

আকাশে তাকিয়ে তার প্যারাস্যুটটা এবার দেখতে পেলাম। মিনিট-খানেকের মধ্যে শ'খানেক গজ দূরে সে নামল।

প্যারাস্যুট ও সঙ্গের যৎসামান্য লটবহর গুছিয়ে নিয়ে দূরবীণ দিয়ে চারিধার আর একবার ভালো করে দেখে অবাক হয়ে বললাম,— "কই হে, মেরুর একটা শেয়ালও ত দেখতে পাচ্ছি না। তোমার ডাঃ মিনোস্কি এই মহাশ্মশানে কোথায় লুকিয়ে থাকবেন।"

"আছেন নিশ্চয়ই কোথাও এখানে! এবং আমাদের তাঁকে খুঁজে বার করতেই হবে।"

"আহা, সে কথা ত অনেকবারই শুনিয়েছ। কিন্তু জায়গাটা ভুল করনি ত? এই চেল্যুস্কিন অন্তরীপ হ'ল উত্তর মেরুর দিকে রাশিয়ার শেষ স্থলবিন্দু। তারপর শুধু অনন্ত মেরুসমুদ্র। ঠিক এই জায়গাটিই ডাঃ মিনোস্কি তাঁর যুগান্তকারী পরীক্ষার জন্য বেছে নিয়েছেন এ খবরটার কোন ভুল নেই ত'।"

"না, তা'তে ভুল নেই।" মিখায়েল খুব জোরগলায় ঘোষণা করলেও মনে হ'ল তার মনেও একটু সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

সন্দেহ কিন্তু সত্যই অমূলক। তুষার-ঢাকা সেই তুন্দ্রার মধ্যে ডাঃ মিনোস্কিকে আমরা শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেলাম। কিন্তু তার আগে তাঁকে খোঁজার মূলে কি ছিল, একটু বলে দেওয়া বোধ হয় দরকার!

অনেকেই বোধ হয় জানে না যে, গত মহাযুদ্ধের পর থেকে পৃথিবীর ছু'টি প্রধান শক্তি নিজেদের অজেয় করে তোলবার জন্যে মহাশূন্যে পর্যন্ত ঘাঁটি বানাবার কথা ভাবতে শুরু করেছে। একজন বৈজ্ঞানিক ত' তাঁর পরিকল্পনা কাগজে কতকটা প্রকাশও করে দিয়েছেন। পৃথিবী থেকে মাইল পঞ্চাশ উঁচুতে ক্ষুদে চাঁদের মতই

একটা শূন্যে ভাসমান বন্দর বসান হবে। সে বন্দর চাঁদের মতই পৃথিবীর সঙ্গে তার চারিধারে ঘুরপাক খাবে। আর সেই বন্দর যে প্রথম মহাশূন্যে ভাসাতে পারবে, বলতে গেলে পৃথিবী তার হাতের মুঠোয়। মহাশূন্যে এই বন্দর ভাসানো শুধু 'রকেট' অর্থাৎ হাউই-বিমানের দ্বারাই সম্ভব। দু'টি মহাশক্তি তাই হাউই-বিজ্ঞান সম্বন্ধে পরস্পরের কাজের ওপর কড়া নজর রেখেছে। এ-বিজ্ঞানে কে কোন্ দিকে কতখানি এগিয়ে গেল, সোজাসুজি জানবার উপায় যে নেই তা বলাই বাহুল্য, তাই দুই রাজ্যের কল্পনাতীত পুরস্কারের লোভে প্রাণ হাতে নিয়ে বহু গুপ্তচর এই বিষয়ে যথাসম্ভব খবর সংগ্রহ করবার আশায় ঘুরছে।

অবশ্য ডাঃ মিনোস্কির ওপর এই গুপ্তচরদের নজর না পড়াই উচিত। হাউই-বিজ্ঞান তাঁর গবেষণার বিষয় নয়। আগের যুগে যেমন আইনস্টাইন, এযুগে তেমনি তিনি অসাধারণ একজন গণিতবিশারদ। অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে যে অসীম অঙ্কের রহস্য রয়েছে—তার জট্ খোলায় তিনি আর সকলের চেয়ে অনেকদূরে এগিয়ে গেছেন।

এই মিনোস্কিও গুপ্তচরদের লক্ষ্য হ'তে পারেন একথা ভাবতে পারলে বিশ হাজার ফুট থেকে এই চেল্যুস্কিন অন্তরীপের ওপর আমি ঝাঁপ দিতে রাজী অবশ্য হতাম না। কিন্তু সেকথা যথাসময়ে বলা যাবে।

দূরবীণ চোখে দিয়ে—মিখায়েলের সঙ্গে সেই তুষার-ঢাকা তুন্দ্রা যখন আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখছি, তখনও আমি জানি যে মিনোস্কিরই গোপন নিমন্ত্রণে তাঁর আশ্চর্য রেডিও-টেলিস্কোপ দেখতে আমি এসেছি। তাঁর নিজের ফরমাশ মত এই আশ্চর্য টেলিস্কোপ যে রাশিয়ার এক জায়গায় বসান হয়েছে, এ খবর দুনিয়াসুদ্ধ লোক তখন পেয়েছে। শুধু জায়গাটা যে কোথায়, দু'চারজন ওপরওয়ালা বাদে তা রাশিয়ার কেউও জানে না। এ টেলিস্কোপ এযুগে অসাধারণ এক কীর্তি। আলো দিয়ে নয়,

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বেতার তরঙ্গ দিয়ে সুদূর মহাশূন্যের খবর এ টেলিস্কোপে পাওয়া যায়। অ্যারিজোনার লাওয়েল অবজারভেটারির, কি দক্ষিণ আফ্রিকার ব্লুমফনটেনের টেলিস্কোপের চেয়ে এই বেতার দূরবীক্ষণ-যন্ত্র অনেকগুণ শক্তিশালী। তাছাড়া এ টেলিস্কোপের সুবিধে হ'ল এই যে, মেঘ, কুয়াশা বা ধোঁয়া কিছুতেই অচল হয় না। আলোর ওপর যার নির্ভর সে টেলিস্কোপ আরিজোনা বা দক্ষিণ আফ্রিকার মরুর মত নির্মেঘ নির্মল আকাশের দেশে বসাতে হয়, কিন্তু এ টেলিস্কোপের সেরকম কোন হাঙ্গামা নেই। এরকম একটি টেলিস্কোপ ইংলণ্ডেও কিছুদিন হ'ল বসান হয়েছে; কিন্তু ডাঃ মিনোস্কির টেলিস্কোপ নাকি তার চেয়ে অনেক জোরালো। শুধু তাই নয়, এ টেলিস্কোপের সাহায্যে মিনোস্কি এমন এক আশ্চর্য পরীক্ষা নাকি করছেন, বিজ্ঞানের যুগ যাতে পাল্টে যাবে।

এহেন লোক আমায় নিমন্ত্রণ করেছেন শুনে তেমন অবাক আমি হইনি। কারণ মিনোস্কির সঙ্গে অনেক আগেই আমার আলাপ হয়েছিল। তখন অবশ্য বিশ্ববিখ্যাত তিনি হননি।

নিমন্ত্রণটা বিশ্বাস করলেও এরকম লুকিয়ে সেটা করার কারণ আমি প্রথমটা বুঝতে পারিনি। মিখায়েলই সেটা বুঝিয়ে দিয়েছিল।

কোন শত্রুপক্ষের লোক না হ'লেও আমি বিদেশী বটে। আর যত প্রভাব প্রতিপত্তিই থাক, বিদেশী একজন বন্ধুকে এসব গোপন জিনিস দেখানো মিনোস্কির পক্ষেও শোভন নয়। নেহাত আমাকে ভালো ক'রে জানেন বলেই নিজের একান্ত বিশ্বাসী শিষ্য মিখায়েলের কাছে নিজের গোপন আস্তানার ঠিকানা জানিয়ে তারই মারফত এ নিমন্ত্রণ তিনি ক'রে পাঠিয়েছেন। তার গোপন ঠিকানা মিখায়েলেরও আগে জানা ছিল না।

এ নিমন্ত্রণের কথা যখন আমি শুনি, তার কিছুদিন আগে মিখায়েলের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে! আলাপ সে কতকটা গায়ে পড়েই করেছিল, কিন্তু হাতীর মত বিরাট চেহারার খরগোসের

মত শান্তশিষ্ট লোকটাকে আমার খারাপ লাগেনি তার জন্যে। মিনোস্কির দূত হয়েই সে যে আসল কথার সুযোগের অপেক্ষায় আমার সঙ্গে এভাবে আলাপ জমিয়েছে, এটুকু জানবার পর তার ওপর যেটুকু বিরাগ ছিল তাও কেটে গেছে। নিমন্ত্রণের কথা জানবার পর মিখায়েলের পরামর্শ মত ওপরওয়ালাদের কাছে যেটুকু খাতির আছে, তাই কাজে লাগিয়ে মিথ্যে অজুহাতে প্লেন যোগাড় করে তা থেকে প্যারাস্যুটে যথাস্থানে নামবার ব্যবস্থা করি। পাছে কেউ সন্দেহ করে ব'লে মিখায়েল নিজে এসব যোগাড়-যন্ত্রের ব্যাপারে মাথা গলায়নি। মাথা গলান উচিত নয় বলেই আমায় বুঝিয়েছিল।

আসলে মিথ্যে সে যে কিছু বলেনি, সেই তুষার তুন্দ্রার রাজ্যে মিনোস্কির গোপন মানমন্দির খুঁজে পাবার পর ভালো করেই বুঝলাম।

মানমন্দিরটি এমনভাবে তৈরি যে নেহাত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে না দেখলে তা' তুষার ঢাকা তুন্দ্রার অংশ বলেই মনে হ'বে। খুঁজে বার করতে সেই জন্যেই আমাদের অত কষ্ট হয়েছিল।

মানমন্দিরের ভেতর ঢুকে সমস্ত কষ্ট কিন্তু সার্থক মনে হ'ল। এই চিরতুষারের দেশে মাটির নিচে এমন স্বর্গপুরী যারা বানিয়েছে, মনে মনে তাদের তারিফ না করেও পারলাম না।

কিন্তু আরামে স্বর্গপুরী হলেও এ কিরকম মানমন্দির! কোথায় আশ্চর্য যন্ত্রপাতি, কোথায় বা আর সব লোকজন?

বাইরে যেখানে পারা-জমানো শীত, মানমন্দিরের ভেতরে সেখানে ঠাণ্ডার কোন বালাই নেই। বড়ো একটা জাহাজের মত পরম সুখে দিন কাটাবার সব রকম আয়োজন উপকরণই সেখানে প্রচুর। শুধু আসল জিনিসের কোন চিহ্ন নেই।

শেষ পর্যন্ত মিনোস্কির কাছে নিজের কৌতূহলটা প্রকাশ না ক'রে পারলাম না।

বিরাট একটা চাকার মত প্যাঁচলাগান দরজা খুলে মিনোস্কি

নিজেই আমাদের সিঁড়ি দিয়ে ভেতরে নিয়ে এসেছিলেন। প্রথমটা একটু অবাক হ'লেও আমায় চিনতে পেরে তাঁর আনন্দ যেন আর ধরে না।

"একি দাস তুমি! তুমি এখানে আসবে আমি ভাবতেই পারিনি।"—ব'লে আমার হাত ধরে সজোরে তিনি ঝাঁকানি দিয়েছিলেন।

আমিও একটু ঠাট্টা ক'রে বলেছিলাম,—"আমিই কি পেরেছিলাম। হঠাৎ প্লেনটা বিগড়ে যাওয়ায় প্যারাস্যুটে নেমে পড়লাম!"

"ওঃ প্যারাস্যুটে নেমেছ!"

তাঁর বিস্ময়টুকু দেখে হেসে বলেছিলাম, "সাধে কি আর নেমেছি। আপনার শিষ্য এই মিখায়েলের কাছে শুনলাম, অন্য কোন রকম নামা নাকি আপনার পছন্দ নয়। তবে প্যারাস্যুটের দড়ি যে ভাবে জড়িয়ে গেছল, খুলতে আর একটু দেরি হ'লে আপনার নিমন্ত্রণ রাখা এ জন্মে আর হ'ত না।"

"তাই নাকি! এত কাণ্ড ক'রে তোমাকে নিমন্ত্রণ রাখতে হয়েছে!"—ব'লে তিনি বেশ একটু গম্ভীর হয়ে গেছেন।

মিখায়েল অবশ্য একান্ত অনুগত শিষ্যের মত এর মধ্যে একটি কথাও বলেনি।

মিনোস্কি এখন ঘুরে ঘুরে সমস্ত জায়গাটা আমাদের দেখাচ্ছিলেন। তারই মধ্যে এক সময় আমার মনের কথাটা ব'লে ফেললাম।—"এ-সব দেখে কি হবে ডাঃ মিনোস্কি! এর বদলে কুইন মেরী বা কোন বড় জাহাজ দেখলেই ত পারতাম।"

"জাহাজই ত দেখছেন!"—মিনোস্কির মুখে অদ্ভুত একটু হাসি।

"জাহাজ দেখছি। ঠাট্টাটা বুঝতে পারলাম না।" মিখায়েলের গলা এতক্ষণে প্রথম শোনা গেল। সে গলার স্বর যেন অন্যরকম!

"ঠাট্টা নয়! সত্যিই এটা জাহাজ। এমন জাহাজ যা এপর্যন্ত কল্পনাও করেনি।"

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে মিনোস্কি আবার বললেন, "কিন্তু ঠাট্টার বদলে একটু ঠাট্টা করলেই বা দোষ কি! গুপ্তচর মিচেল যে আমার শিষ্য মিখায়েল হ'য়ে উঠেছে, এটা একটু বেয়াড়া ঠাট্টা ব'লেই ত আমার মনে হয়।"

অবাক্ হ'য়ে আমি যা বলতে যাচ্ছিলাম তাতে বাধা দিয়ে মিনোস্কি বললেন,—"তুমিও শেষে এই নীচ কাজে নামবে, আমি ভাবিনি দাস।"

ব্যাকুলভাবে এবার জানালাম,—"বিশ্বাস করুন ডাঃ মিনোস্কি, আমি এসবের কিছুই জানি না। মিখায়েলকে সত্যিই আপনার শিষ্য ভেবে ওর কথায় বিশ্বাস করেছিলাম।"

ছদ্মবেশী মিচেল এবার নির্লজ্জভাবে হেসে উঠে বললে—"তোমার মত আহাম্মককে তা না বিশ্বাস করাতে পারলে এখানে আসবার প্লেন, নামবার প্যারাস্যুট যোগাড় হ'ত কি করে! আমার কার্যোদ্ধারই যে নইলে হ'ত না।"

"কার্যোদ্ধার সত্যি হয়েছে ভাবছো!" মিনোস্কি বজ্রস্বরে ব'লে উঠলেন,—"আমাদের পুলিশ এতই কাঁচা মনে করো! তোমরা এখানে রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা সব কথা আমায় বেতারে জানিয়ে দিয়েছে। আমায় সাহায্য করবার প্রহরীও তারা পাঠাচ্ছিল। আমিই বারণ ক'রে দিয়েছি।"

"বারণ ক'রে ভালো করেন নি ডাঃ মিনোস্কি।"—মিচেলের আসল চরিত্র তার গলার স্বরেই এবার বোঝা গেল,—"কি পরীক্ষা আপনি এখানে করছেন এখনো জানতে পারিনি, কিন্তু এখানকার যা কিছু দরকারী জিনিস সব সমেত আপনাকেও এখান থেকে পাচার করবার ব্যবস্থা করতেই আমি এসেছি। আমার নির্দেশ পেয়ে আমাদের দুটি প্লেন শীগ্‌গিরই এখানে নামবে।"

অবিচলিতভাবে মিনোস্কি একটু হেসে বললেন, "কিন্তু নেমে কিছু পাবে কি?"

"হ্যাঁ পাবে!" মিচেল দাঁত খিঁচিয়ে উঠল, "কোনো চালাকি

যাতে তার আগে আপনি না করতে পারেন সেজন্যে আপনাকে একটু বাঁধব। এই সুঁটকো কালা আদমীটা অবশ্য ধর্তব্যই নয়।"

যেমন চেহারা তেমনি মত্ত হাতীর মতই পদভরে ঘর কাঁপিয়ে মিচেল এবার এগিয়ে এল। পর মুহূর্তেই দেখা গেল ঘরের এক কোণের একটা সোফার ওপর ডিগবাজি খেয়ে পড়ে সে কাতরাচ্ছে।

জামাটা যেটুকু নাট হয়েছিল ঠিক ক'রে নিয়ে বললাম, "আর কিছু দরকার হবে ডাঃ মিনোস্কি ?"

"ধন্যবাদ দাস ! আর কিছুর দরকার নেই। তুমি না সাহায্য করলেও অবশ্য কিছু ক্ষতি হ'ত না। আমি তৈরি ছিলাম।"

কাতরাতে কাতরাতেও মিচল গর্জে উঠল—"তৈরি থাকা বার করে দিচ্ছি ! আমাদের লোকেরা এখানে নামলো ব'লে !"

"তার আগে তোমাকে যে অনেক নামতে হবে।" ব'লে মিনোস্কি আমার দিকে ফিরলেন—"শোন দাস, বিজ্ঞানের এক আশ্চর্য পরীক্ষা এবার আমি করতে যাচ্ছি। পরীক্ষায় বাঁচব কি মরব জানি না। তাই এই শয়তানকেই শুধু আমার সঙ্গী করতে চাই। তুমি ইচ্ছে করলে এখন চলে যেতে পারো।"

"এত বড় সৌভাগ্য শুধু ওই শয়তানই পাবে। আমি কি অপরাধ করলাম !"

হেসে আমার পিঠ চাপড়ে মিনোস্কি বললেন,—"এই জবাবই তুমি দেবে জানতাম। যাও, ঐ সোফাটায় আরাম করে বস গিয়ে, যাও !"

সোফায় বলতে না বসতেই মিনোস্কি দেয়ালের একটা কি বোতাম টিপলেন। সঙ্গে সঙ্গে মেঝের একটা জায়গা ফাঁক হয়ে যেন ভোজ-বাজিতে অদ্ভুত একটা যন্ত্র বেরিয়ে এল। সে যন্ত্রের একটা কি হাতল টেনে ধরতেই কি যে হ'ল, কিছুই আর জানতে পারলাম না।

জ্ঞান যখন হ'ল তখন দেখি ঠিক সেই ঘরেই সেই সোফাতেই বসে আছি। মিচেল তখনও অসাড় হয়ে তার জায়গায় পড়ে আছে। আর মিনোস্কি ঘরের একদিকের কাঁচের জানলার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরে কি দেখছেন।

তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে বললাম,—"কি হল কি বলুন ত? কি দেখছেন আপনি?"

"নিজেই দেখো না।" ব'লেই তিনি হাসলেন।

দেখে সত্যিই স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। মেরুর তুষার-ঢাকা তুন্দ্রার বদলে এ যে টকটকে লাল বালির মরুভূমি! "একি সাহারা নাকি!" সবিস্ময়ে ব'লে ফেললাম।

মিনোস্কি এবার সশব্দে হেসে উঠে বললেন,—"না, তার চেয়ে আর একটু দূর,—এ হ'ল মঙ্গল গ্রহের লাল বালির মরুভূমি। মঙ্গল গ্রহকে যার জন্য লাল দেখায়।"

মঙ্গল গ্রহ!—আমার না মিনোস্কির কার মাথা খারাপ হয়েছে তখন ভাবছি। কিন্তু তুষার-ঢাকা তুন্দ্রার বদলে লাল মরুভূমি ত সত্যিই দেখতে পাচ্ছি। পৃথিবীর কোন মরুভূমির সঙ্গে তার মিলও নেই।

আমায় আবার সোফায় নিয়ে এসে বসিয়ে মিনোস্কি বললেন,—"সত্যিই, মঙ্গল গ্রহে আমরা নেমেছি। আমার পরীক্ষা সফল।"

আমার বিমূঢ়তায় একটু হেসে তিনি আবার বললেন,—"মঙ্গল গ্রহ এবার পৃথিবীর কত কাছে এসেছে, খবরের কাগজেও তা বোধ হয় পড়েছ। পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব এখন চার কোটি তিন লক্ষ মাইলের কাছাকাছি। কিন্তু এত কাছে এলেও, কোন হাউই যন্ত্র দিয়ে ঘণ্টায় চার হাজার মাইল ছুটেও মাস দেড়েকের আগে আমরা পৌঁছাতে পারতাম না। সে জায়গায় প্রায় চক্ষের নিমেষে আমরা এসেছি বলা যায়।"

"কিন্তু এলাম কি ক'রে!"—আমি আগের মতই বিমূঢ়।

"এসেছি ফুটো দিয়ে গ'লে!" আমার বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "হ্যাঁ সত্যিই ফুটো! মহাশূন্যের ফোর্থ ডাইমেনসন্ মানে চতুর্থ মাপের ফুটো! লম্বা, চওড়া, উঁচু—এই তিন মাপ দিয়েই সৃষ্টির সবকিছু আমরা দেখতে জানি। গণিত-বিজ্ঞান এছাড়া আরও মাপের সন্ধান পেয়েছে, কিন্তু তা কাজে

লাগাতে কেউ পারেনি এ পর্যন্ত। আমার এই পরীক্ষায় প্রথম সেই চতুর্থ মাপের জগৎ মানুষের আয়ত্তে এল।

ব্যাপারটা তোমায় আর একটু ভাল ক'রে বোঝাই। খুব লম্বা একটা চিমটে মনে করো। এক দিকের ডগা থেকে আর এক দিকের ডগায় পৌঁছতে হ'লে একটা পিঁপড়েকে সমস্ত চিমটেটা মাড়িয়ে যেতে হবে। তাতে তাকে হাঁটতে হবে ধরো তিন গজ। কিন্তু চিমটের একটা ফলা থেকে আর একটা ফলা মাত্র এক ইঞ্চি দূরে যদি থাকে, আর ওপরের ফলা থেকে নিচের ফলায় যাবার একটা ফুটো যদি পিঁপড়েটা পায়, তা হ'লে এক ইঞ্চি নেমেই তিন গজ হাঁটার কাজ তার সারা হয়ে যাবে। লম্বা, চওড়া ও উঁচু—এই তিন মাপের জগতে যা অনেক দূর চতুর্থ মাপ দিয়ে সেখানে অতি সহজে পৌঁছবার এমন অনেক ফুটো মহাশূন্যে আছে। তেমনি একটা ফুটোই আমি খুঁজে পেয়েছি।"

এবার উৎসাহে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম,—"মঙ্গল গ্রহটা তাহলে ত ঘুরে দেখতে হয়।"

হেসে আমায় নিরস্ত করে মিনোস্কি বললেন, "না না, এবার সেজন্যে তৈরি হ'য়ে আসিনি। তাছাড়া এ ফুটো থাকতে থাকতেই পৃথিবীতে ফিরে যেতে হবে। অন্ততঃ ওই শয়তান মিচেলটার জ্ঞান হবার আগে।"

মিচেলের জ্ঞান পৃথিবীতে ফিরেই হয়েছিল। তখন তার হাতে হাতকড়া। প্লেনে ক'রে মিনোস্কিকে চুরি করতে যারা নেমেছিল তাদের অবস্থাও তথৈবচ।"

ঘনাদার কথা শেষ হতে না হতেই শিবু ব'লে উঠল, "এই বছরেই ত জুন জুলাই-এর মাঝামাঝি মঙ্গল গ্রহ পৃথিবীর অত্যন্ত কাছে এসেছিল শুনেছি। কিন্তু সশরীরে তখন আপনি এই মেসেই ছিলেন মনে হচ্ছে।"

কোন উত্তর না দিয়ে শিশিরের হাত থেকে সিগারেটের টিনটা অন্যমনস্কভাবে তুলে নিয়ে ঘনাদা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দাঁত

মাছ ধরতে যাওয়া আর হ'ল না।

এতদিনের এত জল্পনা কল্পনা আয়োজন উদ্যোগ সব ভেস্তে গেল। অথচ কি উৎসাহ নিয়েই না সব ব্যবস্থাপত্তর করা গেছল। কি নিখুঁত তোড়জোড়! কি নির্ভুল অভিযানের খসড়া!

মাছ ধরা ত নয়, সত্যিই রীতিমত একটা যুদ্ধযাত্রা।

শিবুর ওপর কমিসেরিয়েটের ভার, শিশির আছে আর্সেনাল-এর তদারকে, আর গৌর নিয়েছে ট্রান্সপোর্টের ঝক্কি।

অর্থাৎ শিবু ব্যবস্থা করবে ভূরি-ভোজনের, শিশির যোগাবে ছিপ বঁড়শি, টোপ, চার, আর গৌর দেবে পৌঁছে সেই আশ্চর্য অজানা জলাশয়ে, যেখানে সভ্যতার সংস্পর্শহীন সরল মাছেরা এখনো কুটিল মানুষের কারসাজির পরিচয় পায়নি।

তার পর শুধু ছিপ ফেলা আর মাছ তোলা।

গত ক'দিন ধরেই তাই দারুণ উৎসাহ উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে মেসের দিন কাটছে। ধরার পর অত মাছ আনা যাবে কি করে তাই নিয়েও তুমুল তর্ক হ'য়ে গেছে এবং আনাও যদি যায়, তাহলে বাজারে কিছু বিক্রি করতে ক্ষতি কি, এ প্রস্তাব করতে গিয়ে খেলোয়াড়ী মেজাজের অভাবের অভিযোগে শিবুকে দস্তুরমত অপ্রস্তুত হ'তে হয়েছে।

শখের মাছ ধরে এনে বিক্রি!

মাছ চালানোর ব্যবসা করলেই হয় তাহলে!

এই বেফাঁস কথার সাফাই গাইতে শিবুকে সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগের পর্যন্ত দোহাই পাড়তে হয়েছে। এত মাছ একসঙ্গে এনে এই ভাদ্রের গরমে পচলে শহরের স্বাস্থ্য বিপন্ন হ'তে পারে এই তার বক্তব্য।

কিন্তু তাতেও সে পার পায়নি।

পাবে কেন। খিঁচিয়ে উঠেছে শিশির।

বিলিয়ে দেব আমরা।—উদার হ'য়ে উঠেছে গৌর।

প্রতিবেশীদের মধ্যে কাদের কাদের মাছ বিলিয়ে অনুগ্রহ করা যায়, তার একটা তালিকাও তৈরি হ'তে বিলম্ব হয় নি।

এই তালিকা তৈরির মাঝখানে উদয় হয়েছেন ঘনাদা।

শিশিরের কাছে তিন হাজার তেষট্টিতম সিগারেট-টা ধার নিয়ে ধরাতে ধরাতে বলেছেন, কিহে তোমাদের Operation Pisces-এর কতদূর!

'জানতি পার না'-র জ দেওয়া 'পিসেজ' শুনে প্রথমটা একটু ভড়কে গেলেও তাড়াতাড়ি সামলে নিয়েছি। শিবু থাকতে আমরাও বিদ্যেয় কম যাই নাকি! 'পিসেজ' ত জ্যোতিষের মীন অর্থাৎ মৎস্য রাশির ল্যাটিন নাম। আমরা হেসে বলেছি,—দূর আর কোথায়! আপনার জ্যোতিষের মৎস্য রাশি উঠোনে এনে ফেলেছি বললেই হয়।

উৎসাহের চোটে সেই আশ্চর্য পুকুরের সরল সুবোধ মাছদের কথা উচ্ছাস ভরেই শুনিয়েছি এবার।

ঘনাদা কিন্তু শুধু একটু মুখ বেঁকিয়েছেন।

মাছ ধরতে তাহলে যাচ্ছ না।—ঘনাদার কথায় যেন কোথায় খোঁচা।

যাচ্ছি না মানে? কি করতে যাচ্ছি তাহলে?

বলো মাছ মারতে! মাছ ধরা আর মারার মধ্যে তফাত আছে কিনা। একটা হ'ল খেলা আর একটা খুন। যে মাছ খেলাতেই জানে না, তাকে ধরা নয়, শুধু মারা-ই যায়।

কথাগুলো মোটেই মনঃপূত হয় নি আমাদের। তাই খুঁত ধরে বলেছি,—মাছ আবার খেলাতে জানবে কি! মানুষই ত মাছকে খেলিয়ে তোলে।

খেলায়, খেলায়, মাছও খেলায়। তেমন মাছ হলে মানুষকেই খেলায়; আর মাছ যদি খেলোয়াড় না হয়, তাহলে ছিপ ধরাই মিছে। তবে তেমন খেলোয়াড় আর আজকাল আছে কোথায়? শেষ দেখেছিলাম নীলিমা-কে।

নীলিমা! আমরা অবাক্।

হ্যাঁ, নীলিমা। নামটা অবশ্য আমারই দেওয়া। মেয়ে নয়, মাছ। ওপরে গাঢ় নীল আর নীচে ধোঁয়াটে রুপোলী। পাক্কা সাত হাত বিশমনী 'টুনী'। ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাভালন শহরের নাম শুনেছ কি না জানি না। মোটর বোটে ছিপ দিয়ে সমুদ্রের 'টুনী' ধরার খেলা সেই শহরের মাথা থেকেই প্রথম বেরোয়। কিন্তু নীলিমার কাছে সেই শহরের মাথা একেবারে হেঁট হ'য়ে গেছল সেবার। বাঘা বাঘা 'টুনী' শিকারী যেখানে জমা হয়, অ্যাভালনের সেই 'টুনা' ক্লাব একেবারে নিঃঝুম। নীলিমার কাছে হার মেনে সমস্ত শহর মর্মাহত। নীলিমা টোপ গেলে অম্লানবদনে, কিন্তু সে যেন শিকারীকে আহাম্মক বানাবার জন্যেই। নাচিয়ে খেলিয়ে বেচারা শিকারীকে নাকালের চূড়ান্ত ক'রে শেষ পর্যন্ত ছিপের সুতোটি কি ভাবে সে কেটে পালায় কেউ বুঝতে পারে না। তাই নীলিমা মাছের ছদ্মবেশে জলকন্যা এমন একটা গুজবও তখন রটে গেছে।

সেই অ্যাভালন শহরে সেবার······

বেড়াতে গেছলেন, আর বাঘা বাঘা শিকারীরা যার কাছে মাথা মুড়িয়েছে সেই নীলিমাকে মোটর-বোটের বদলে ডাঙা থেকেই হুইলের জায়গায় হাত-ছিপে-ই ধরে সবাইকে একেবারে তাক লাগিয়েই দিয়ে ছিলেন এইত? ঘনাদার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে এইভাবে শেষ করেও গৌর থামেনি, তার ওপর জুড়ে দিয়েছে—

এ আর শোনাবেন কি ! খবরের কাগজেই ত তখন বেরিয়েছিল। আমরা পড়েছি।

গৌর আমাদের দিকে সমর্থনের জন্যে তাকিয়েছে। কলের পুতুলের মত আমরাও মাথা নেড়ে সায় দিয়েছি বটে কিন্তু বুঝতে তখন আর আমাদের বাকি নেই যে, অবস্থা চিকিৎসার বাইরে গেছে।

একসঙ্গে ঘনাদার গল্প তাড়াতাড়ি থামান ও তাঁকে খুশি রাখাই হয়ত গৌরের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু ফল হয়েছে হিতে বিপরীত।

না পড়নি—ঘনাদার গলায় বিষাদের মেঘের ডাক—পড়তে পারো না। কারণ ব্যাপারটা যা বানালে তা' নয়। আর খবরের কাগজে কিছু বার করতেই দেওয়া হয় নি।

শুনুন ঘনাদা, শুনুন !

আর শুনুন ! ঘনাদা ততক্ষণে সিঁড়ি দিয়ে তাঁর টঙের ঘরে উঠছেন।

গৌরের ওপর আমরা সবাই খড়্গহস্ত হয়েছি।

দিলি ত সর্বনাশ ক'রে।

বাঃ আমি ত ভালোই করতে চেয়েছিলাম।—গৌরের করুণ কৈফিয়ত—খবরের কাগজে পড়েছি শুনলে খুশি না হয়ে খাপ্পা হবেন কে জানত ! তাছাড়া স্টেশন ওয়াগন যে দেবে, তার সঙ্গে এই সকালেই দেখা না করলে নয়। গল্প একবার গড়ালে দুপুরের আগে কি থামত ?

দোষ গৌরকে খুব দেওয়া যায় না। মাছ ধরার আয়োজনের এই ঝামেলার মধ্যে ঘনাদার গল্পটা মুলতুবি রাখার পক্ষে আমাদের সবারই সায় ছিল মনে মনে।

কিন্তু ঘনাদার মন ত আর তা শুনে গলবে না।

সেই যে তিনি বেঁকলেন, আর সোজা করে কার সাধ্য। উৎসাহ না থাকলেও আমাদের খেয়ালে আপত্তি তাঁর ছিল না আগে। আমাদের সঙ্গ ও শিক্ষা দেবার কথাও দিয়েছিলেন। সেকথা তিনি

স্পষ্ট করে ফিরিয়ে নেন নি এখনো। কিন্তু ভাবগতিক দেখে আমরা চিন্তিত।

রবিবারে আমাদের অভিযান! শুক্রবারে ঘনাদা তাঁর ঘর থেকে সন্ধ্যের পর নামলেন না। ঠাকুর ওপরেই খাবার দিয়ে এল। শুনলাম তাঁর সর্দি। শনিবার সকালে শোনা গেল সর্দির সঙ্গে জ্বরভাব, আর রাত্রের বুলেটিন-এ জানলাম দাঁতের ব্যথা।

দাঁতের ব্যথা!—খাবার ঘরে আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম।

খাওয়ার পরই একতলায় শিশিরের ঘরে দরজা ভেজিয়ে মন্ত্রণাসভা বসল। ঘনাদা যে আমাদের সব মজা মাটি করবার প্যাঁচ কষেছেন তা আর বুঝতে তখন বাকি নেই। কিন্তু আমাদেরও

জেদ ঘনাদাকে পাই বা না পাই, মাছ ধরতে যাব-ই। আর তার আগে ঘনাদাকে একটু জব্দও না করলে নয়।

পরদিন সকাল সাতটা বাজতে না বাজতেই ঘনাদার ঘরে গিয়ে সবাই আমরা হাজির। আমরা আর সদ্য ভাজা এক প্লেট গরম 'ক্রোকেট'।

কি ব্যাপার ঘনাদা! তিন দিন ধরে নিচে নামছেন না, আমাদের সঙ্গে যাবেন না নাকি?

কি করে আর যাই!—ঘনাদার দীর্ঘশ্বাস আমাদের, না 'ক্রোকেটের' প্লেটের উদ্দেশে বোঝা কঠিন।

হ্যাঁ, দাঁতের ব্যথা নিয়ে যাওয়া উচিতও নয়,—আমরা সহানুভূতিতে গদগদ—কিন্তু ক্রোকেটগুলো কেমন হ'ল আপনাকে একটু চাখানোও ত তাহ'লে যাবে না। সবই আমাদের ভাগ্য। চল হে।

আমাদের সঙ্গে ক্রোকেটের প্লেটও অন্তর্ধান হওয়ার উপক্রম দেখে ঘনাদা আর বুঝি সামলাতে পারলেন না।

অত যখন পেড়াপীড়ি করছ দাও দেখি একটা চেখে।—ঘনাদার নেহাত যেন অনিচ্ছা।

আমাদেরও যেন সঙ্কোচ—কিন্তু এই দাঁতের ব্যথায়···

গৌর প্লেটটা ঘনাদার প্রায় নাকের কাছ দিয়েই ঘুরিয়ে নিয়ে যায় আর কি!

তার হাত থেকে প্লেটটা একরকম কেড়ে নিয়েই ঘনাদা আত্ম-বিসর্জনের সুরে বললেন,—হোক ব্যথা। একটা দায়িত্বও ত আছে। সঙ্গেও যাব না, আবার কি ছাইপাঁশ সঙ্গে নিচ্ছ দেখেও দেব না, তা কি পারি!
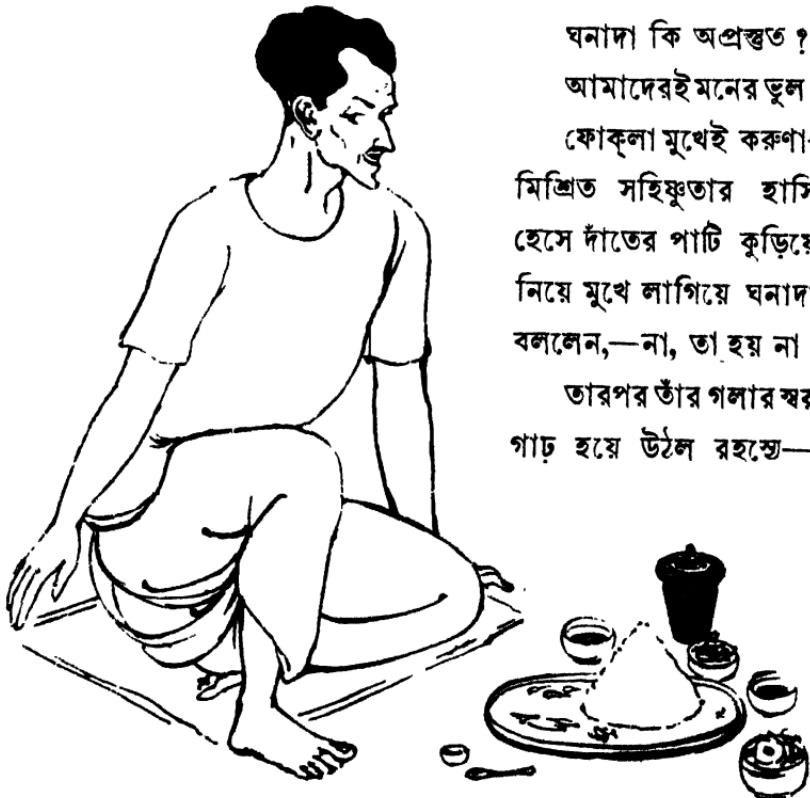
প্রথম কামড়টা নির্বিঘ্নে-ই পড়ল, তারপর দ্বিতীয় কামড়—কটাস্।

আমরা একসঙ্গে হাঁ হাঁ করে উঠলাম।

একদিকে ক্রোকেটের ভেতর থেকে বড় মার্বেল গুলিটা মেঝেতে,

আর একদিকে ঘনাদার মুখ থেকে তুপাটি দাঁত প্লেটের ওপর তখন ছিট্‌কে পড়েছে।

চোখ বড় বড় করে সেদিকে তাকিয়ে গৌর গলায় মধু ঢেলে জিজ্ঞেস করলে,—বাঁধানো বলে মনে হচ্ছে না? বাঁধানো দাঁতেও ব্যথা হয় তাহলে?

ঘনাদা কি অপ্রস্তুত? আমাদেরই মনের ভুল! ফোক্‌লা মুখেই করুণা-মিশ্রিত সহিষ্ণুতার হাসি হেসে দাঁতের পাটি কুড়িয়ে নিয়ে মুখে লাগিয়ে ঘনাদা বললেন,—না, তা হয় না। তারপর তাঁর গলার স্বর গাঢ় হয়ে উঠল রহস্যে—

তবে ছেলেমানুষী চালাকি ক'রে আজ তোমরা যা জানলে, একদিন তা ধরা পড়লে এই তুনিয়ার চেহারাখানাই পাল্টে যেত। কাঁচা দাঁত তুলিয়ে সেদিন যদি না বাঁধিয়ে রাখতাম, আর সেই নীলিমার কাছে হদিস যদি না পেতাম, তা'হলে পৃথিবীর ইতিহাস আজ অন্যভাবে লেখা শুরু হ'ত।

আবার নীলিমা! আমরা চঞ্চল হ'য়ে উঠি ঘর থেকে বেরুবার জন্যে।

কিন্তু ঘনাদা তখন ব'লে চলেছেন,—এই তুপাটি বাঁধানো দাঁতই এক ভুঁইফোড় রাজ্যের লোভের থাবা থেকে সেদিন মানুষকে বাঁচিয়েছে।

অ্যাভালন শহরের নাম সেদিন করেছি। শহরটা কোথায় বলিনি। এ শহর হ'ল ক্যালিফোর্নিয়ার পশ্চিমে সেণ্ট ক্যাটালিনা নামে ছোট এক দ্বীপে। পুরো দ্বীপটা যেন একটা নাদাপেট বেলেমাছ, দক্ষিণমুখো চলেছে। অ্যাভালন শহরটা যেন তার চোখ। এ শহরে বেড়াতে আমি যাইনি শখ করে। গেছলাম ডে-কস্টা নামে এক পুরনো বন্ধুর ডাকে। ডে-কস্টা নামে অবশ্য তাঁকে খুঁজে পাবার আশা করিনি। শ্রীকৃষ্ণের শতনামের মত তারও নামের সংখ্যা অগুনতি, আর সেই সঙ্গে ছদ্মবেশও। কিন্তু নাম আর চেহারা তার যত রকমেরই হোক, স্বভাব তার চিরকাল এক। যেখানে কোন গোলযোগের গন্ধ, সেখানেই ডে-কস্টা। জীবনে কত বিপদের মুখেই যে তু'জনে একসঙ্গে দাঁড়িয়েছি তার হিসেব নেই। এই কিছুদিন আগেও অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক অ্যাণ্টনি ফিশার অন্তর্ধান হওয়ার পর তাঁর খোঁজে প্রাণ হাতে নিয়ে কি না করেছি। খোঁজ যে পাইনি সে অবশ্য আমাদের একটা কলঙ্ক। এই ডে-কস্টার জরুরী সঙ্কেত-টেলিগ্রাম পেয়েই অ্যাভালনে ছুটেছিলাম। টেলিগ্রামে এখনকার নাম সে দেয়নি। যে নামেই থাকুক, তাকে খুঁজে আমি বার করবই, সে জানত।

ঘনাদার দম নেওয়ার ফাঁকে নিচে স্টেশন ওয়াগনের হর্ন শুনতে পেলাম। মন তখনও উসখুস করছে।

আচ্ছা তা'হলে—ব'লে গৌর ত উঠেই দাঁড়াল, কিন্তু ওই উঠে দাঁড়ান পর্যন্তই।

ঘনাদা আবার ধরলেন।

অ্যাভালনে নেমেই ডে-কস্টাকে খুঁজে ঠিক বার করলাম। কিন্তু জীবিত অবস্থায় নয়। ডে-কস্টা আমার পৌছবার আগের দিনই সেণ্ট ক্যাটালিনার পশ্চিম দিকের সমুদ্রে কেমন ক'রে ডুবে

মারা গেছে। ওখানকার কজন জেলে তার হাঙরে ঠোকরান মৃতদেহটা উদ্ধার করেছে কোন মতে। অ্যাভালনের কেউ তাকে ডে-কস্টা বলে সনাক্ত করতে অবশ্য পারেনি। মিলার বলে যে ছদ্মনামে সে এখানে ছিল, দু'একজন সেই নামেই তাকে চিনেছে।

ডে-কস্টার ডুবে মরাটা আমার কাছে কেমন রহস্যময় ঠেকলো। ফুর্তির সাঁতার কাটতে ডুবে মরার ছেলে ত সে নয়! কি করতে সে এখানে এসেছিল? আমাকেও ডেকে পাঠাবার কারণ কি?

ডে-কস্টাই নেই—এ রহস্যের হদিস্ কে দেবে! তবু তার সঙ্কেত টেলিগ্রামটা আর একবার পড়ে দেখলাম। ডে-কস্টা অতি সাবধানী। সঙ্কেত-লিপিতে পাঠানো টেলিগ্রামের পাঠোদ্ধার করলেও কিছু সন্দেহ করবার নেই। টেলিগ্রামের কথা হ'ল এই, —অ্যাভালনের 'টুনি' মাছ সব শিকারীর স্বপ্ন। ধরবে ত তাড়াতাড়ি এস।

না, এ টেলিগ্রামে আসল রহস্যের কিছুই বোঝবার উপায় নেই। সত্যিই রহস্য কিছু নেই এমনও কি হ'তে পারে! সঙ্কেত-লিপিটা হয়ত তার রসিকতা, আসলে ক'দিনের ছুটি উপভোগ করবার জন্যে টুনি মাছ ধরতে সে আমায় ডেকে পাঠিয়েছে, এমন হওয়াও ত সম্ভব।

কিন্তু এ ব্যাখ্যা মন কেন যেন মানতে চায় না। ডে-কস্টার মত মানুষ খেলা কি ছুটির মর্ম জানে না, রহস্যের পেছনে ছোটাই তাদের জীবন, তাদের ছুটি।

তা'হলে 'টুনি' শিকারের মধ্যেই রহস্যের সূত্র হয়ত কোথাও লুকিয়ে আছে নাকি?

অ্যাভালন শহরে তখন নীলিমাই একমাত্র প্রসঙ্গ। রাস্তায় ঘাটে দোকানে বাজারে ও ছাড়া আর কথা নেই। টুনা ক্লাবে তাই যেতে হ'ল। ছিপ নিয়ে মোটর-বোট ভাড়া ক'রে একদিন টুনি-শিকারেও বেরুলাম। দেখাও পেলাম নীলিমার, আর কানমলাও যথারীতি। নাচিয়ে খেলিয়ে নীলিমাকে যখন প্রায় বোটে তুলতে

যাচ্ছি, কেমন করে ওই ইস্পাতের তারের মত শক্ত সুতো কেটে সে পালাল।

রোখ চেপে গেল আমারও। কিন্তু একদিন দু'দিন তিনদিন নীলিমার কাছে নাকের জলে চোখের জলে হ'য়ে চার দিনের দিন আর শিকারে বেরুলাম না। মোটর-লঞ্চ ভাড়া করে গেলাম আসল ক্যালিফোর্নিয়ার নিউ পোর্ট শহরে। ডুবুরীর পোশাক পরে গভীর সমুদ্রের তলায় বল্লম দিয়ে মাছ শিকার সেখানকার এক খেলা। একদিন সেই খেলায় কাটিয়ে টুনা ক্লাবে ফিরতেই টিট্কিরি শুনলাম, —কি রে নিগার! 'টুনা' ধরার শখ মিটলো! পালিয়েছিলি কোথায় ?

টিট্কিরি আর কারুর নয়, ক্লাবের সবচেয়ে ধনী সভ্য বেনিটো-র। যেমন বদখদে সাদা গণ্ডারের মত লোকটার চেহারা, তেমনি তার পয়সার অহঙ্কার। সাদা চামড়ার সভ্যদের সে মানুষ বলে গণ্য করে না, ত আমাকে।

আমার কাছে কোন জবাব না পেয়ে সে আমার টেবিলের ধারেই এসে দাঁড়িয়ে গরিলার মত হাতের বিরাশি সিক্কা একটি চাপড় আমার পিঠে বসিয়ে মুলোর মত দাঁত বের করে সে হেসে বললে—তুই গুগলি ধর বুঝেছিস, হাঁটু-জলে কাদা ঘেঁটে গুগলি। যেমন মানুষ তেমনি ত শিকার।

ঠাট্টার ছলে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি গরিলা-হাতের রদ্দা।

তবু কোন জবাব না দিয়ে শুধু একটু হাসলাম।

বেনিটো ঘৃণাভরেই এবার আমায় রেহাই দিয়ে চলে গেল।

বেশীর ভাগ পয়সার সামনে দণ্ডবৎ হ'লেও মার্কিন-মাত্রেই অমানুষ নয়। বেনিটোর এই অহেতুক জুলুম অনেকেরই খারাপ লেগেছে বুঝলাম। কেউ কেউ এসে আমার ওপর রাগও দেখালে —তুমি মানুষ না কি! কি বলে ওই অসভ্য জানোয়ারটার জুলুম সহ্য করলে বলত' !

হেসে বললাম,—জুলুম আর কি। বড়লোকের রসিকতাই ওই

রকম। অত বড় একটা নিজস্ব পেল্লয় জাহাজ নিয়ে যে তুনিয়া টহল দিয়ে বেড়াতে পারে, কত তার পয়সা ভাবতে পারো। ওরকম লোক আমাদের মত মানুষকে পোকা-মাকড় মনে করবে না ত করবে কে! একটু খুশি রাখলে ওর জাহাজের পার্টিতে একদিন নেমন্তন্নও ত পেতে পারি।

মার্কিন বন্ধুরাও মুখ বেঁকিয়ে সরে গেল। বুঝলাম আমার ওপর যেটুকু শ্রদ্ধা তাদের ছিল তাও খুইয়েছি।

কিন্তু বেনিটোর জাহাজের পার্টিতে সত্যিই একদিন নিমন্ত্রণ পেলাম।

তার আগে নিউপোর্ট থেকে আনা ডুবুরীর পোশাকে একদিন সমুদ্রে আমি নেমেছি। কোন কোন মরীয়া টুনি শিকারী তখনও নীলিমাকে ধরবার আশা ছাড়েনি। মোটর-বোট নিয়ে তু'একজন সেদিনও তাই বেরিয়েছে।

নীলিমার অজেয় হওয়ার রহস্য সেদিনই বুঝলাম আর সেই সঙ্গে ডে-কস্টার মৃত্যু-রহস্যও বুঝি কতকটা।

কিন্তু আসল যে রহস্য তখন অনুমানও করতে পারিনি, বেনিটোর জাহাজের পার্টির রাতেই তা জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল।

জাহাজ ত নয়, জলের ওপর স্বর্গপুরী! টুনা ক্লাবের সবাই ত বটেই, অ্যাভালনের নামকরা কেউ নিমন্ত্রণ থেকে বাদ পড়েনি। মস্ত ওপরের ডেক ঝল্‌মল করছে রং-বেরং-এর আলোর পোশাকে। নাচগান, খাওয়া, ফুর্তি চলছে অবিরাম।

সারা রাতই চলবার কথা। কিন্তু রাত সাড়ে বারোটায় হঠাৎ সমস্ত উৎসব থেমে গেল এক নিমেষে। ডেকের ওপরকার সমস্ত ফুর্তিবাজের দল যেন কাঠের পুতুলের মত স্তব্ধ। শুধু বেনিটোর কর্কশ বাজখাঁই-গলা শোনা গেল—

—বন্ধু সব, আমার জানাতেও ঘৃণা হচ্ছে যে আপনাদের মধ্যে এমন একজন নীচ নোংরা জানোয়ার আছে যে অতিথি হওয়ার

সুযোগ নিয়ে চুরি করতে এখানে ঢুকেছে। আমার অত্যন্ত মূল্যবান কিছু কাগজপত্র ও জিনিস এই জাহাজে আমি সঙ্গে নিয়ে বেড়াই। এইমাত্র আমি জানতে পেরেছি যে, সকলের স্ফূর্তি করার সুযোগে আমার সেই গুপ্ত সিন্দুক-ঘরের দরজা সে কৌশলে খুলে ঢুকেছে। ঢুকে যাই সে করুক, এ জাহাজ থেকে পালাতে সে পারেনি এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। ধরা তাই সে পড়বেই। আজকের উৎসব বাধ্য হয়েই আমাকে এখানে বন্ধ করতে হচ্ছে। আপনাদের শহরে ফিরে যাবার লঞ্চের ব্যবস্থাও আমি অবিলম্বে করছি, কিন্তু তার আগে নিজেদের আত্ম-সম্মানের খাতিরেই, আপনারা যদি নিজেদের নাম জানিয়ে আপনাদের কাছে আমার মূল্যবান জিনিস যে কিছু নেই, তার প্রমাণ স্বেচ্ছায় দিয়ে যান আমি বাধিত হ'ব।

খানাতল্লাশিতে কিছুই অবশ্য পাওয়া গেল না এবং বলাবাহুল্য সব অতিথি বিদায় নেবার পর যে নামটি বাকি রইল তা আমার।

জাহাজের একটি কামরাতেই তখন আমি বসে আছি। ক'টা সিগারেট যে পুড়েছিল, মনে নেই, কিন্তু কামরার দরজার হাতলে বাইরে থেকে হাত পড়তেই উঠে দাঁড়িয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বললাম, এসো বেনিটো, তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি! খানাতল্লাশি করতেই বুঝি এত দেরি হ'ল!

বেনিটোর হতভম্ব ভাবটা কাটতে কয়েক সেকেণ্ড লাগল। তারপর হিংস্র গরিলার সঙ্গে রঙে ছাড়া তার মুখের আর বুঝি কিছু তফাত রইল না।

কিন্তু এভাবটাও সে সামলে নিলে। ইঁদুরকে থাবার মধ্যে পেলে শিকারী বেড়াল তখুনি তাকে কামড়ে ছিঁড়ে খায় না।

বেনিটো অদ্ভুত এক পৈশাচিক মুখ-টেপা হাসি হেসে আমার দিকে এগিয়ে এল। তার মুখ দেখে বুঝলাম এমন তারিয়ে-তারিয়ে জিঘাংসা মেটাবার সুযোগ পেয়ে তার আনন্দ আর ধরে না।

ব্যাং হয়ে সাপের গর্তে সিঁধ কেটেছিস, তোর সাহস আছে বলতেই হবে। কিন্তু লাভ কি হ'ল এ সাহসে। পারবি পালাতে?

বেনিটোর শেষের কথাগুলোয় রাগের চিড়বিড়িনি চাপা রইল না। তবু হেসে বললাম,—পালাতে যাবই বা কেন? তোমার জাহাজটা ত তোফা আরামের।

বলে বসতে যাচ্ছিলাম, এক হেঁচ্‌কায় আমায় টেনে তুলে দাঁতে-দাঁতে কিষ্কিন্ধ্যার কড়মড়ানি তুলে বেনিটো বললে,—আরামই তোকে দেব, তার আগে কোথায় কি লুকিয়েছিস দেখি।

অম্লান-বদনে হাত তুলে দাঁড়ালাম। তন্ন তন্ন করে সব পরীক্ষা করে বেনিটো গর্জন ক'রে উঠলো, ভেবেছিস এখন কোথাও লুকিয়ে

রেখে পরে পাচার করবি সুযোগ বুঝে। কিন্তু তার আগে তোকেই যে পাচার হ'তে হবে।

ডে-কস্টার মত, কেমন !

এক মুহূর্তের জন্যে চমকে উঠে বেনিটো আরো হিংস্র হয়ে উঠলো,—হাঁ, ডে-কস্টার মত। সেও তোর মত এ-জাহাজের রহস্য ফাঁক করতে এসেছিল।

এ-জাহাজের রহস্য তাহ'লে আছে কিছু! দামী জিনিসের মধ্যে আমি ত লুকনো সিন্দুকে এক বাণ্ডিল কাগজই দেখলাম।

সে কাগজ তুই ঘেঁটেছিস তাহলে? বেনিটোর রাগের পারা চড়ছে।

তা ঘেঁটেছি বই কি, তবে নিইনি যে কিছু সে ত তুমি নিজেই গুনে দেখেছ।

আমার নির্বিকার ভাবটাই বুঝি বেনিটোর বেশী অসহ্য।

না নিলেও টুকে যে রাখিসনি তাতে বিশ্বাস কি!

ও বাবা, ওই বিদঘুটে মাথা-গুলোনো এক বাণ্ডিল অঙ্ক আমি টুকব, এইটুকু সময়ে!

যাই করে থাকিস্ নিস্তার তোর নেই। এ-জাহাজের রহস্য জেনে কেউ জ্যান্ত ফেরে না। ডে-কস্টার মতই তোকে হাঙরদের ভোজে লাগাবার ব্যবস্থা করছি এখুনি। তবে তোর ওই কেলে মাংস হাঙরেও বোধ হয় ছোঁবে না।

তা'হলে তোমার মত যে মাংস হাঙরের পছন্দ, তাই তাদের পাতে দিলে ভাল হয় না?

কি বলব, ক্ষ্যাপা গরিলা না ষাঁড়, না দুই-এর একত্র-সম্মিলনের মত বেনিটো এবার আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

জামাটা ঝেড়ে নিয়ে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললাম, অনেক দিনের অনেক কিছুর শোধ নেবার আছে বেনিটো, এত তাড়াতাড়ি কিসের?

ঘাড়মুড় গুঁজে কেবিনের যে ধারে বেনিটো পড়েছিল, সেখান

থেকে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে এবার সে সাবধানে আমার দিকে এগুতে লাগলো। তাড়াহুড়োয় কিছু হবে না সে বুঝেছে।

কাছাকাছি এসেই সাঁড়াশীর মত দু'হাত দিয়ে সে আমায় জাপ্টে ধরতে গিয়ে সেই যে পড়লো আর ওঠবার নাম নেই। রদ্দাটা অত জোর হবে ভাবিনি।

কোমর ধরে তুলে তাকে কামরার শোফাটার ওপর বসিয়ে দিলাম।

পরমুহূর্তেই দেখি তার পিস্তল আমার দিকে তাক করা। আমি তাকে ধরে তোলবার সময়, সুযোগ পেয়ে সে পকেট থেকে সেটা বার করেছে।

এইবার শয়তান! শয়তানের মতই বেনিটোর মুখের হাসি—বল কি করেছিস আমার সিন্দুকের কাগজপত্র ঘেঁটে?

সিগারেটে একটা টান দিয়ে বললাম,—আর বলে লাভ কি! বললেও যা, না বললেও তাই। মরতে ত হবেই।

না, সত্য কথা যদি বলিস ত একটা সুযোগ তোকে দেব।

শুনতে পাই সুযোগটা?

এই জাহাজ থেকে সাঁতরে দ্বীপে যাবার সুযোগ।

হেসে বললাম,—ডে-কস্টাকেও এই সুযোগই ত দিয়েছিলেন, কিন্তু এখানকার হাঙরগুলো যে বড় হ্যাংলা।

এখনও রসিকতা!—বেনিটো চীৎকার করে উঠলো, এ পিস্তলটা কি রসিকতা মনে হচ্ছে?

পাগল, বিশেষ তোমর মত আনাড়ির হাতে। কিন্তু যা বলব শুনলে যদি তোমার মেজাজ আরো খারাপ হয়?

তবু শুনতে আমি চাই।—বেনিটো হুঙ্কার দিলে।

তবে শোন, নেহাত যখন ছাড়বে না। ও কাগজপত্রের আমি ফটো নিয়েছি।

ফটো নিয়েছিস্?

হ্যাঁ, নির্ভুল মাইক্রোফটো যাকে বলে, এক এক করে সব পাতার।

অতিকষ্টে নিজেকে সামলে নিল বেনিটো, কোথায় সে-সব ফটো!

সে-সব তো আর এ জাহাজে নেই।

জাহাজে নেই! উত্তেজনায় বেনিটো উঠে দাঁড়ালো—কোথায় ফেলেছিস্!

ফেলব কেন! পাঠিয়ে দিয়েছি। আশ্চর্য যে guided missile অর্থাৎ দূর থেকে চালানো অস্ত্রের এখানে পরীক্ষা চালাচ্ছ; অস্ত্র পরীক্ষার সঙ্গে রসিকতার লোভ সামলাতে না পেরে টরপেডোর মত যে জলে-ডোবা অস্ত্র দিয়ে টুনী শিকারীদের ছিপের সুতো কেটে নীলিমাকে অজেয় করে তুলে সবাইকে থ করে দিয়েছ, সেই টরপেডো দিয়েই নিউপোর্ট-এর সমুদ্রকূলে সে-সব ফটো পাঠিয়ে দিয়েছি। খবর যাদের দেওয়া আছে, কাল সকালেই সমুদ্রতীর থেকে টরপেডো তুলে তা' খুলে তারা সে-সব ফটো উদ্ধার করবে।

মিথ্যা কথা!—বেনিটোর আর্তনাদ না চীৎকার বোঝা যায় না—সে টরপেডো একজন ছাড়া কেউ চালাতে জানে না।

যে জানে সেই চালিয়েছে!—আমার নয়, বেনিটোর পেছনে আর একজনের কণ্ঠস্বর। শীর্ণদেহ কিন্তু ঋজু সৌম্য চেহারার এক বৃদ্ধ বেনিটোর পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কখন তিনি তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, বেনিটো উত্তেজনার মধ্যে বুঝতেও পারে নি।···

দিশাহারা অবস্থায় তার মুখ দিয়ে ক'টা অস্ফুট আওয়াজ শুধু বেরোয়—আপনি—অ্যান্-ট-নি···

হ্যাঁ, আমি অ্যান্টনি ফিশার। চুরি করে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে পাঁচ বছর ধরে যাকে দিয়ে ক্রীতদাসের মত যা খুশি তোমরা করিয়েছ, সেই হতভাগ্য নীচ বৈজ্ঞানিক। আমি দুর্বল, মরতে আমি ভয় পাই। তাই তোমাদের হুকুম কাপুরুষের মত আমি তামিল

করেছি। আমায় দিয়ে শুধু এই দূর থেকে চালানো অস্ত্র তোমরা তৈরি করিয়ে নাওনি, যে কোবাল্ট বোমা আজও কেউ তৈরি করতে পারেনি, তার সমস্ত অঙ্ক লিখিয়ে নিয়েছ। সে অঙ্কের খাতা আর তোমাদের শুধু একলার নয়, তার হুমকি দেখিয়ে ছুনিয়াকে আর তোমরা ভয় দেখাতে পারবে না এই আমার সান্ত্বনা। নর-পিশাচদের হাতের পুতুল হ'য়ে যে আমায় থাকতে হবে না, তার জন্যে এই মানুষটিকে ধন্যবাদ।

বেনিটোর হাত থেকে তার পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে বললাম—আমায় নয়, ধন্যবাদ দিন সেই ডে-কস্টাকে, প্রাণ দিয়ে এ-রহস্যের কিনারা করার ইঙ্গিত যে দিয়ে গিয়েছে।

তার সঙ্কেত টেলিগ্রাম যে আপনাকেই নিয়ে তা এতদিনে কাল সবে বুঝেছি। টুনা-শিকারীর কথাটার ভেতর যে অ্যান্টনি ফিশার নামটা লুকানো আছে তা আগে মাথাতেই আসেনি।

কিন্তু—কিন্তু—ফটো তোলা হ'ল কিসে? বেনিটো এই হতাশার মধ্যেও জিজ্ঞেস না করে পারেনি। আমি গোপনে কে কি নিয়ে জাহাজে উঠেছে সব সন্ধান রেখেছি। ছোট-বড় কোন ক্যামেরা তোমার কাছে দেখা যায়নি। ক্যামেরা তোমার ছিল কোথায়?

আমার কথা শুনেও ক্যামেরা কোথায় ছিল বুঝতে পারছ না?

কথা শুনে মানে? হঠাৎ মানেটা বুঝতে পেরে বেনিটো মেঝের ওপরই হতভম্ব হয়ে বসে পড়লো।

হ্যাঁ, সোজাসুজি ক্যামেরা আনলে ধরা পড়তে হবে জানতাম বলেই এমন ব্যবস্থা করেছিলাম যা সন্দেহের বাইরে। আমার বাঁধানো দাঁতই গুপ্ত ক্যামেরা। ছবি সমেত সেই বাঁধানো দাঁতজোড়া-ই টরপেডোতে পাঠিয়েছি। ফোক্‌লা মুখে সব কথা যদি না বোঝাতে পেরে থাকি ত ছুঃখিত।

আমার রন্দায় যা হয়নি এই শেষ ক'টা কথায় তাই হ'ল। বেনিটো মাথা ঘুরে পড়ে একেবারে অজ্ঞান।

টর্পেডো গুপ্ত ক্যামেরায় ফটো নিয়ে যথাস্থানেই পৌঁছেছিল। বেনিটো আর তার জাহাজটাকে তার পরদিন থেকে সেণ্ট ক্যাটালিনার ধারে-কাছে কিন্তু কেউ দেখেনি। সেই সঙ্গে টুনা ক্লাবের আর একটি লোককে যার সম্বন্ধে ক্লাবের সভ্যদের ধারণা আজও অত্যন্ত নীচু।

ঘনাদা থামলেন।

মাছ ধরতে যাওয়ার আর তখন সময় নেই।

মোহনবাগান বনাম ঈস্ট বেঙ্গলের চ্যারিটি ম্যাচের চার-চারটে 'হোয়াইট গ্যালারির' টিকিট আগে থাকতে কেনা থাকা সত্ত্বেও, ঢাকা, বরিশাল, হুগলী ও বর্ধমান জেলার চারিটি সুস্থ সবল উগ্র ক্লাবপ্রেমিক যুবক, আষাঢ় মাসের একটা আশ্চর্য-রকম খটখটে বিকেলে ঘরে ব'সে কাটিয়েছে, এমন কথা কেউ কখনো সুস্থ মস্তিষ্কে বিশ্বাস করতে পারে ?

জানি তা পারা সম্ভব নয়, তবু এই অবিশ্বাস্য ঘটনা আমাদের জীবনে ঘটেছে ব'লে তার কাহিনী অত্যন্ত লজ্জিতভাবে নিবেদন করছি। ঘনাদার সঙ্গে যাদের পরিচয় হয়নি এবং ঘনাদার মত অঘটন-ঘটন-কুশলী অসামান্য ব্যক্তি যাদের মেসে নাই, তাদের কাছে এ-কাহিনী বলা যে বৃথা বাক্যব্যয় তা অবশ্য জানি।

ঘনাদা যে দিনকে রাত করতে পারেন এবং অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন, একথা তারা জানবে কি করে ? সওয়া পাঁচটায় খেলা আরম্ভ, কিন্তু সেদিন আমরা পরস্পরকে তাগাদা দিতে শুরু করেছি বেলা বারোটা থেকেই। টিকিট আগে থাকতে কেনা থাকলে কি হয়, টিকিট যারা কিনে রেখেছে, গেটে তাদের ভিড়ও ত কম নয়! সেই ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই যদি খেলা শুরু হয়ে যায়, তা'হলে তখন খেলা দেখব, না, সীটের নম্বর খুঁজে বেড়াব ? না, যেতে যদি হয়, আগে যাওয়াই ভাল। সর্বসম্মতিক্রমে এই

প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে আমরা ক্ষণে-ক্ষণে পরস্পরকে উৎসাহিত যেমন করেছি, নজরও রেখেছি তেমনি এ-ওর ওপরে।

আমাদের গৌর বড় বেশী ঘুম-কাতুরে। দুপুরে খাওয়ার পর একটু গড়িয়ে নেওয়া তার চাই-ই, আর একবার গড়ালে কত বেলা পর্যন্ত তা যে গিয়ে ঠেকবে, তার কোন ঠিক নেই। তাই শিবু তাকে পাহারা দিয়েছে। আধ ঘণ্টা, পনরো মিনিট অন্তর জিজ্ঞাসা করছে, "কিরে গৌর জেগে আছিস ত ?" তারপর গৌরের ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত ও উত্তরোত্তর উষ্ণতর প্রতিবাদ শুনে বলেছে, "দেখিস, ঘুমোসনি যেন !"

শিবুর ওপর আবার পাহারায় রাখতে হয়েছে শিশিরকে। শিবুর বড় ভুলো-মন। ঠিক বেরুবার সময় রাস্তায় বেরিয়ে সে হয়ত বলবে, "ওই যাঃ, মনি-ব্যাগটা ফেলে এসেছি", কিংবা নিদেন পক্ষে বলবেই, "দাঁড়া ভাই—ঘরের জানালাটা বন্ধ ক'রে আসি, নইলে বৃষ্টিতে সব ভিজে যাবে।"

শিশির তাই মিনিটে-মিনিটে শিবুকে সাবধান করেছে, কোনো-কিছু ভুল যেন তার না হয় ! শিশিরের ওপর আবার নজর রাখতে হয়েছে আমাকে। কোনো-কিছু দরকারী কাজে বেরুবার ঠিক আগের মুহূর্তে তার একটা কিছু হারাবেই। হয় একটি-পাটি জুতো সে খুঁজে পাবে না, কিংবা পাঞ্জাবির বোতাম তার কোথায় যে আছে মনে করতে না পেরে নিজের ও আমাদের সকলের টেবিল দেরাজ ঘেঁটে সে তছনছ করবে।

ওদের সকলকে পাহারা দেওয়া সত্যি দরকার। কিন্তু আমাকে অমন ক্ষণে-ক্ষণে বিরক্ত করার সত্যি কোনো মানে হয় ? ওদের ধারণা—কোথা থেকে এ-ধারণা হ'ল তা জানি না—আমার নাকি সময়ের কোনো জ্ঞান নেই। এক-আধ ঘণ্টা এদিক-ওদিক কখনো-কখনো আমার হয় না এমন কথা বলছি না, কিন্তু তাই ব'লে পনরো মিনিট অন্তর 'ঘড়িটা একবার দেখুন দিকি !'—অথবা, 'কটা বাজলো খেয়াল আছে ?'—শুনতে কার ভাল লাগে।

বিরক্ত হয়ে শেষে ঘড়িটাই আমি গৌরের বিছানার ওপর ফেলে দিয়ে বলেছি, "ঘড়িটা নিজের কাছেই রাখ না, ক'টা বাজলো তাহ'লে আর মিনিটে মিনিটে জিজ্ঞেস করতে হবে না।"

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘনাদা ঘরে ঢুকে গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলেছেন, "উঁহুঃ, ঠিক হচ্ছে না, ঠিক হচ্ছে না ওটা।"

"কি ঠিক হচ্ছে না, ঘনাদা"—অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করেছি আমরা।

ঘনাদা তখ্‌খুনি কোনো জবাব না দিয়ে ধীরে-সুস্থে শিশিরের টেবিল থেকে কেসটা তুলে তা থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে আরাম ক'রে—আরাম-কেদারার অভাবে তার বিছানার ওপরই দুটো বালিশ ঠেসান দিয়ে ব'সে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বলেছেন, "ওই না দেখেশুনে ঘড়ি নেওয়া।"

ঘনাদার রকম-সকম ভাল মনে হয়নি। ইশারায় শিশির, গৌর, শিবুকে সাবধান ক'রে দিয়ে একটু হেসে বলেছি, "ও-ঘড়ি আর দেখবার শোনবার কিছু নেই ঘনাদা, সুইটজারল্যাণ্ডের একেবারে সবচেয়ে বনেদী-কারখানার ছাপ ওতে মারা।"

ঘনাদা একটু হেসেছেন, "ছাপ ওরকম মারা থাকে। ছাপ দেখে কি আর ঘড়ি চেনা যায়?"

"আপনি, ঘড়িও চেনেন নাকি ঘনাদা?" শিবু বুঝি না জিজ্ঞেস ক'রে পারেনি।

"হ্যাঁ, তা একটু চিনি বইকি! না চিনলে এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আর কি হ'তো? তার দরকারই হ'তো না।"

ঘনাদার সঙ্গে আমাদের বেশ ভালোরকমই পরিচয় আছে, তবু এ-কথার পর খানিকক্ষণ আমরা একেবারে থ' হয়ে গেছি। কারুর মুখ দিয়ে কোনো কথাই বেরোয়নি। গৌরই প্রথম বলেছে, "কিন্তু, ঘড়ি ত' আপনাকে ব্যবহার করতে কখনো দেখলাম না!"

"না, ঘড়ি-টড়ি আমি ব্যবহার করি না!" সিগারেটে একটা

সুখটান দিয়ে ঘনাদা বলেছেন, "তবে, ঘড়ি একবার পেয়েছিলাম কয়েকটা।"

"পেয়েছিলেন? ক'টা ঘনাদা?"—শিশিরের বিদ্রূপটা খুব অস্পষ্ট নয়। কিন্তু ঘনাদা নির্বিকারভাবে খানিক চোখ বুজে থেকে বলেছেন, "যতদূর মনে পড়ছে, মোট, দু'লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার তিনশো একটা।" ঘনাদার কাছে থাকা আর নিরাপদ নয় বুঝে শিবুকে তাড়া দিয়ে বলেছি, "ওহে, ওঠো না এইবার। সময়'ত হয়ে এল।"

শিবু তা সত্বেও জিজ্ঞাসা করেছে, "সে-সব ঘড়ি গেল কোথায় ঘনাদা? কোথায় রেখেছেন মনে নেই বুঝি?"

"নাঃ, মনে থাকবে না কেন, খুব মনে আছে। সেগুলো রেখেছিলাম, ১২৫ ডিগ্রি দ্রাঘিমা যেখানে ৩৫ ডিগ্রি অক্ষাংশকে কেটে বেরিয়ে গেছে ঠিক সেইখানে। তবে সেগুলো এখন অচল।"

ঘনাদা গলাখাঁকারি দিয়ে নড়ে-চড়ে বসতেই সভয়ে উঠে প'ড়ে শিশিরকে ঠেলা দিয়ে বলেছি, "উঠে পড়ো শিশির, তুমি ত' আবার শিরে সংক্রান্তির সময় জুতো খুঁজতে জামা হারিয়ে ফেলবে।"

কিন্তু ঘনাদা তখন শুরু ক'রে দিয়েছেন,…"১৯৩৭ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর, প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণে যে বিরাট সাইক্লোন আর টাইড্যাল-ওয়েভ অর্থাৎ প্রলয় বন্যা দেখা দেয়, তার কথা তোমাদের মনে আছে কিনা জানি না। তবে, খবরের কাগজে বিশদভাবেই সব বিবরণ বেরিয়েছিল। টাইড্যাল-ওয়েভের পাহাড়-প্রমাণ ঢেউ পশ্চিমে নিউজিল্যাণ্ড ও পুবে দক্ষিণ-আমেরিকার চিলির পার্বত্য-উপকূল পর্যন্ত তো পৌছয়ই; উত্তরে, অথবা ঠিক ক'রে বলতে গেলে, উত্তর-পশ্চিমে ডুসি, পিট্‌কেয়ার্ন দ্বীপ থেকে শুরু ক'রে তাহিতি, টোঙ্গা, ফিজি, সামোয়া পর্যন্ত অসংখ্য দ্বীপ প্রায় ভাসিয়ে নিয়ে যায় বললেই হয়। অস্ট্রাল দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটা ত' একেবারে নিশ্চিহ্নই হয়ে গিয়েছিল কিছুকালের মত। প্রচণ্ড ঝড়ে আর এই সমুদ্র-*বন্যায় কত লোক যে মারা যায় তার লেখা-জোখা নেই।*

টাইড্যাল-ওয়েভ-এর প্রায় দু'মাস আগের কথা। হাওয়াই থেকে

সামোয়া হয়ে, ফিজি দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত তখন আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা চালাই, তিনটে জাপানী-মালের জাহাজ ভাড়া নিয়ে। আমদানি-রপ্তানির কারবারটা অবশ্য লোক-দেখানো ব্যাপার। বাইরে এই সব দ্বীপ থেকে ইউরোপ আমেরিকায় নারকোল-শাঁস চালান দিয়ে তার বদলে ছুরি কাঁচি থেকে শুরু ক'রে, ঘড়ি সাইকেল সেলাই-এর কল পর্যন্ত টুকি-টাকি নানা জিনিস আমদানি করি। কিন্তু ভেতরে-ভেতরে যে ধান্দায় ঘুরি, তারই সম্পর্কে হঠাৎ একদিনেই আমেরিকা আর ইংলণ্ড থেকে গোপন 'কোডে' লেখা দু'টি রেডিওগ্রাম একসঙ্গে এসে হাজির। নেভিল আর ফ্রাঙ্ক দু'জনেই তখন বেঁচে।"

শিশির অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করেছে, "নেভিল আর ফ্রাঙ্ক? তারা আবার কে?"

গৌর গম্ভীরমুখে বলেছে, "বুঝতে পারলিনে? নেভিল—চেম্বারলেন আর ফ্রাঙ্কলিন—রুস্‌ভেল্ট!"

"ওঁরাই আপনাকে তার করেছিলেন?" চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞাসা করেছে শিবু,—"আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল বুঝি?"

যেন অত্যন্ত সামান্য ব্যাপার, এইভাবে কথাটা হাত নেড়ে উড়িয়ে দিয়ে ঘনাদা বলেছেন, "যাক্‌গে সে-সব কথা। হ্যাঁ, যা বলছিলাম—দুই রেডিওগ্রামেই এক কথা, সমূহ বিপদ, প্রশান্ত মহাসাগরের কাজ ফেলে এক্ষুনি যেন চ'লে আসি।"

কিন্তু একটা মানুষ একসঙ্গে আমেরিকা আর ইংলণ্ডে ত' যেতে পারে না। সেই মর্মেই দু'টো তার দু'জায়গায় পাঠিয়ে আরো বিশদ বিবরণ জানতে চাইলাম।

বিশদ বিবরণ শুধু পরের রেডিওগ্রামে নয়, বেতারের খবরেও কিছুটা তার পরদিন পাওয়া গেল। ইউরোপ, আমেরিকা, ইংলণ্ডের নানা জায়গায় হঠাৎ রহস্যজনকভাবে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়ে বড়-বড় বাড়ি-ঘর, কারখানা, রেলের লাইন প্রভৃতি উড়ে যাচ্ছে। গোয়েন্দা-পুলিশ সব জায়গায় এই অভাবনীয় ব্যাপারে শুধু ছুটোছুটি ক'রে হিমসিম খাচ্ছে না, কিছু বুঝতে না পেরে একেবারে

ভ্যাবাচাকা হয়ে গেছে। ভ্যাবাচাকা হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। কারণ যে-সব জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটছে, পুলিস সেখানে কোনরকম বোমা বারুদ ডিনামাইটের নাম-গন্ধও পাচ্ছে না এবং এরকম এলোপাথাড়ি ধ্বংসের কাজ চালাতে পারে এমন কোনো দেশদ্রোহী প্রবল গুপ্ত-দলের কথাও তাদের জানা নেই।

অবস্থা এই রকম সঙ্গীন ব'লেই, আমাদের বিভাগের বড় বড় মাথা যে যেখানে আছে, সকলের ডাক পড়েছে পরামর্শ-সভায়। কিন্তু ইংলণ্ড ও আমেরিকা, দু' জায়গার কোথায় যাব, দোমনা হয়ে ঠিক করতে না পেরেই শেষ পর্যন্ত স্থির করলাম, সামোয়া-দ্বীপের 'পালোলো'-উৎসবটা আগে না দেখে অন্য কোথাও যাব না। ভাবলাম, কাছে থেকে যা দুর্বোধ, দূর থেকে ঠাণ্ডা-মাথায় সে রহস্যের খেই হয়ত পেয়েও যেতে পারি।

'পালোলো'-উৎসব পৃথিবীর একটি অষ্টম আশ্চর্য ব্যাপার বললেই হয়। বৎসরে মাত্র দু'টি দিন এই উৎসব হয়। সামোয়া আর ফিজি-দ্বীপপুঞ্জের চারিদিকে ঠিক নির্দিষ্ট তারিখে যেন অলৌকিক মন্ত্রবলে 'পালোলো' নামে সংখ্যাতীত এক রকম সামুদ্রিক-পোকা জলের ওপর ভেসে ওঠে, দু' ভাগ হয়ে বংশ-বিস্তার করবার জন্যে। 'পালোলো'র এই বংশ-বিস্তারের লগ্ন সামুদ্রিক মাছেদেরও জানা। ঝাঁকে-ঝাঁকে তারাও সেদিন ভেসে ওঠে। 'পালোলো'-রা বংশ-বিস্তার যত না করে, সমুদ্রের এই মাছেদের পেটে যায় তার বেশী। কিন্তু 'পালোলো' আর মাছের ঝাঁকের ওপরেও আছে আর এক প্রাণী। তারা, পলিনেশিয়ান জেলে। মাছ ও 'পালোলো' দুই-ই তাদের কাছে পরম সুখাদ্য। রাশি রাশি মাছ ও পালোলো ধরবার সুযোগ হয় ব'লে বৎসরের এই দু'টি দিন তাদের কাছে একটা মস্ত পরব।

কিন্তু ঠাণ্ডা-মাথায় খোশ-মেজাজে এ পরব দেখা সেবার আমার ভাগ্যে নেই। হাওয়াই-দ্বীপের হনলুলু থেকে এপিয়া বন্দরে আসবার পথে জাহাজেই ওই দু'টি রেডিওগ্রাম পেয়েছিলাম।

সমোয়া দ্বীপপুঞ্জের উপোলু দ্বীপের এই এপিয়া বন্দরটিই তখন আমার কারবারের প্রধান ঘাঁটি। সেখানে পৌঁছেই খবর পেলাম, দিন তিনেক আগে আমার 'ওয়ার হাউজ' থেকে বড় গোছের একটা চুরি হয়ে গেছে। চুরি না ব'লে তাকে ডাকাতিই বলা উচিত। রাত্রে দরজার তালা ভেঙে প্রায় হাজার পঞ্চাশ টাকার মাল ডাকাতেরা সরিয়ে নিয়ে গেছে, আমার দু'জন পাহারাদারকে পিছমোড়া ক'রে বেঁধে। পুলিসকে খবর আগেই দেওয়া হয়েছিল। নিজে গিয়ে থানায় একবার দেখাও করতে হ'ল। এপিয়া—বৃটিশ এলাকা। প্রধান পুলিশ কর্মচারী আমার বিশেষ পরিচিত 'জন লেমান' নামে একজন মার্কিন। কি-কি ধরনের কত মাল চুরি গেছে, তার একটা তালিকা তাকে দিলাম। দামী মালের মধ্যে ইউরোপ থেকে আনানো শ' পাঁচেক রেডিও সেট আর শ' তিনেক সাইকেল। কয়েক বাক্স ঘড়িও তার মধ্যে ছিল। লেমান আমায় আশ্বাস দিলে যে, মাল যদি চোরেরা ইতিমধ্যে পাচার করেও দিয়ে থাকে, তবু সাইকেল আর রেডিও বেশীর ভাগই সে উদ্ধার ক'রে দিতে পারবে। তবে ঘড়িগুলোর কথা বলতে পারে না। সেগুলো হাতে হাতে লুকিয়ে চালান দেওয়া সহজ। খুশি হয়ে বললাম, তুমি অন্যগুলো যদি উদ্ধার ক'রে দাও, ঘড়িগুলোর জন্যে আমি ভাবি না। সেগুলো নেহাত সস্তা খেলো জিনিস। চেহারা—দামী-

ঘড়ির মত জমকালো হ'লেও, আসলে ছেলে-ভুলানো জাপানী মাল।

কিন্তু এই সস্তা খেলো ঘড়িগুলোই এক জ্বালা হয়ে উঠলো। লেমানের কাছ থেকে বাড়ি ফিরে দেখি, আবার দু'টি 'তার' এসে হাজির। তার একটি লণ্ডন থেকে, আগেরগুলির মতই তাড়াতাড়ি রওনা হবার তাগিদ, আর একটি জাপানের যে কোম্পানি থেকে ঘড়িগুলো আনিয়েছিলাম, তাদের জরুরী আদেশ, যে ঘড়িগুলো আমায় পাঠানো হয়েছে, সেগুলো আমি যেন অবিলম্বে ফেরত পাঠাই, কারণ, আমি যে-ঘড়ির অর্ডার দিয়েছিলাম তার বদলে এগুলি চালান দেওয়া হয়েছে।

যে-ঘড়ি চোখেই দেখিনি তা অর্ডার-মাফিক না অন্য-কিছু, কি ক'রে আব জানবো, ঘড়িগুলো যে আমার গুদাম থেকে চুরি গেছে, এই কথা জানিয়ে এক টেলিগ্রাম ক'রে 'পালোলো'-উৎসবের জন্যে একটি মোটর লঞ্চে ক'রে বেরিয়ে পড়লাম। লণ্ডনের টেলিগ্রামের জবাবই আর দিইনি। মনটা সেজন্যে একটু খচ্‌খচ্‌ করছিল। কাজে ফাঁকি দিয়ে এই পরব দেখতে গিয়েই প্রধান রহস্যের সূত্র যে পেয়ে যাবো, তখন ত' আর জানতাম না!

মাঠের ওপর যেমন মেলা হয়, 'পালোলো'-উৎসব তেমনি সমুদ্রের ওপরকার মেলা। বন্দর ছাড়িয়ে কয়েক মাইল যাবার পর সমুদ্রের একটি বিশেষ অঞ্চলে যে দৃশ্য চোখে পড়ে তা বর্ণনা করা কঠিন। মাইলের পর মাইল জলে অগুনতি 'পালোলো' আর মাছের ঝাঁক কিলবিল করছে। মাছেদের রুপোলী-ডানার ঝিলিকে সমুদ্রে যেন ক্ষণে-ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে মনে হয়। পোকা ও মাছের লোভে অসংখ্য সামুদ্রিক পাখি সেই সঙ্গে সাদা পাখার ঝাপটায় বাতাস তোলপাড় ক'রে ফিরছে। এরই ভেতর যেদিকে চাও, পলিনেশিয়ান জেলেদের নানা রঙের ডিঙ্গি আর জাল। সে-সব ডিঙ্গিতে উৎসবের সাজে মেয়েরাও এসেছে মজা দেখতে। নৌকোগুলোতে নানা রঙের নিশান আর ফুলের সাজ, মেয়েদের মাথায় ও গলায়

ফুলের মালা, কেউ-কেউ আবার বাজনাও এনেছে গান গাইতে ও বাজাতে। আমার মত দু'চারজন শৌখীন লোক একলা, বা দল বেঁধে শুধু এই দৃশ্য উপভোগ করবার জন্যেই নিজেদের মোটর-লঞ্চে বা ছোট স্টীমারে এসে জড়ো হয়েছে।

'পালোলো'-উৎসব খুব ভালভাবেই জমেছিল। উজ্জ্বল, নির্মেঘ আকাশ, ঝড়-বাতাসহীন শান্ত সমুদ্র, হঠাৎ তারি মাঝে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত একটা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল। সেই সঙ্গে কাছাকাছি তিনটি নৌকো আরোহীদের নিয়ে আকাশে টুকরো-টুকরো হয়ে ছিট্‌কে উঠে একেবারে নিশ্চিহ্ন। একি আশ্চর্য ব্যাপার! সমুদ্রের জলে 'মাইন' না থাকলে তো এরকম হ'তে পারে না! কিন্তু 'মাইন' এ-অঞ্চলে কেমন ক'রে থাকবে? আসবে কোথা থেকে?

দেখতে-দেখতে আরো দু' জায়গায় ওইরকম দু'টি বিস্ফোরণ

পর-পর হয়ে গেল। পলকের মধ্যে উৎসবের আনন্দ আতঙ্কে পরিণত হ'ল। সমুদ্র তখনও তেমনি মাছে আর পোকায় কিল্‌বিল করছে, সাগর-চিলগুলো তেমনি ঝাঁকে-ঝাঁকে জলের ওপর ছোঁ মারছে, কিন্তু 'মাইন'-এর ভয়ে জেলেডিঙ্গিগুলো প্রাণপণে সে-অঞ্চল ছেড়ে পালাচ্ছে।

মোটর-লঞ্চে আমিই অবশ্য প্রথম এই দুর্ঘটনার খবর 'এপিয়া'তে নিয়ে এলাম। দেখা করলাম গভর্নরের সঙ্গে। তিনি ত' এ-খবর শুনে একেবারে থ'। যুদ্ধবিগ্রহ নেই—কোন গোলমাল কোথাও নেই, হঠাৎ সামোয়া-দ্বীপপুঞ্জের বিশেষ একটি সামুদ্রিক-অঞ্চলে মাইন ভাসিয়ে দিয়ে যাবে কে? তাও, বন্দরের মধ্যে হ'লে না হয় উদ্দেশ্য খানিকটা বোঝা যেত, যেখানে কস্মিনকালে জেলেডিঙ্গি ছাড়া কোন বড় জাহাজ যায় না, সেখানে এ 'মাইন' ভাসানোতে কার কি স্বার্থ? ভাল ক'রে ব্যাপারটার সন্ধান নেবার জন্যে আমার সঙ্গেই একটি পুলিস-লঞ্চ পাঠাবেন ব'লে গভর্নর ঠিক করলেন। লেমানকে খবর পাঠিয়ে দিলেন, আমায় আমার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাবার জন্যে।

দু'মুঠো খেয়ে নেবার জন্যে আমার আস্তানায় গিয়ে দেখি, আর-এক হাঙ্গামা সেখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। যে-কোম্পানির কাছ থেকে ওইসব ঘড়ি আনিয়েছিলাম, তাদের একজন বড় কর্মচারী নিজে এসেছেন ঘড়িগুলো ফেরত নিয়ে যাবার জন্যে। কর্মচারীর নাম, মিঃ ওকামোতো, শুনলাম তিনি ইয়োকোহামা থেকে প্লেনে ক'রে আজ সকালেই এসে এখানে পৌঁছেছেন ও আমার জন্যে এতক্ষণ ধ'রে অপেক্ষা ক'রে আছেন। একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "ওই-কটা সস্তা খেলো ঘড়ির জন্যে আপনাদের এত মাথাব্যথা?"

একটু সলজ্জভাবে হেসে মিঃ ওকামোতো বললেন, "ঘড়িগুলো সস্তা হ'তে পারে, কিন্তু ভুলটা কোম্পানির পক্ষে বড় বেশী লজ্জার। সেইটে শোধরাবার জন্যেই তাঁদের এত বেশী ব্যাকুলতা।"

"কিন্তু, ঘড়ি যে চুরি গেছে তা ত' আপনাদের জানিয়েছি।"

মিঃ ওকামোতো কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে যা বললেন, তা'তে আরো অবাক হলাম! এ-ঘড়ি ফেরত না নিয়ে যেতে পারলে তাঁর মুখে চুন-কালি পড়বে, তাই এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কিছু গুনাগার দিতেও তিনি প্রস্তুত।

বুঝলাম, ঘড়ি চুরির কথা মিঃ ওকামোতো বিশ্বাস করতেই পারছেন না। একটু বিরক্ত হয়েই তাই বললাম, "আপনাদের ওই ছেলে-ভুলানো ঘড়ি লুকিয়ে রেখে আমার কোন লাভ আছে মনে করেন? সত্যি চুরি গেছে কিনা, চলুন আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।"

চুরি প্রমাণ করবার জন্যে গুদামে যাওয়ার আর দরকার হ'ল না, মিঃ লেমান আমার খোঁজে সেই মুহূর্তেই এসে ঘরে ঢুকলেন। ওকামোতোর সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললাম, "ইনিই এখানকার পুলিস-চীফ্। আমার গুদাম ভেঙ্গে ডাকাতরা ঘড়ি এবং অনেক-কিছু নিয়ে গেছে কি-না, ওঁর কাছেই শুনতে পাবেন।"

মিঃ লেমান আমার কথা সমর্থন করার পর শান্তশিষ্ট ওকামোতো হঠাৎ একেবারে জ্বলে উঠলেন। সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে-যেতে যা ব'লে গেলেন তার মর্ম এই যে, তাঁদের কোম্পানির সঙ্গে এই চালাকি করার ফল কি, আমরা শীগ্গিরই হাড়ে-হাড়ে বুঝবো।

মিঃ লেমান একটু অবাক্ হয়ে বললেন, "কি এমন দামী ঘড়ি মশাই, যার জন্যে এত আস্ফালন!"

"দেখবেন?" ব'লে আমার ম্যানেজারকে একটা ঘড়ি নিয়ে আসতে বললাম। চোরেরা কেস ভেঙে নিয়ে যাবার সময় কয়েকটি ঘড়ি গুদামের মধ্যে অসাবধানে প'ড়ে গেছলো। সেগুলো আমি বাড়িতেই আনিয়ে রেখেছিলাম। ম্যানেজার তা থেকে একটি ঘড়ি এনে আমার হাতে দিলে। লেমান সেটি নিয়ে একটু পরীক্ষা ক'রে বললেন, "এ-জাতের বুদ্ধি সত্যি অসাধারণ। এমনিতে দেখলে মনে হবে, যেন নামজাদা কোন সুইস কোম্পানির হাতঘড়ি!"

হেসে বললাম, "অথচ দাম তার দশ ভাগের এক ভাগও নয়।"

টেবিলের উপর সেখানকার খবরের কাগজটা খোলা ছিল, তার ওপর ঘড়িটা রেখে উঠতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ, ঘড়ির তলায় যে খবরের শিরোনামাটা দেখা যাচ্ছিল সেইটে পড়বামাত্র মাথার ভেতর দিয়ে যেন একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। মিঃ লেমানকে উত্তেজিতভাবে বললাম, "মাপ করবেন মিঃ লেমান, আপনার সঙ্গে আজ যেতে পারছি না। ডাঃ ডেভিসের কাছে এখুনি আমার যাওয়া দরকার!"

"সে কি! ডাঃ ডেভিসের কাছে হঠাৎ কেন?"—অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ লেমান।

"কেন? ডাঃ ডেভিস্ পৃথিবীর একজন নামজাদা রাসায়নিক ব'লে। তিনি যে কয়েক-মাসের জন্য শরীর সারাতে এপিয়াতে এসে বাস করছেন, এও আমাদের সৌভাগ্য ব'লে।"

"কিন্তু 'পালোলো'-উৎসবের দুর্ঘটনাগুলোর রহস্য আগে সন্ধান করতে গেলে ভাল হ'ত না কি?"

"না, মিঃ লেমান, মনে হ'চ্ছে, আপনারও সেখানে যাবার আর

দরকার নেই।" ব'লে টেবিল থেকে ঘড়িটা তুলে নিয়ে মিঃ লেমান কোন কিছু বলার আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

সেদিন সারারাত মিঃ ডেভিসের সঙ্গেই তাঁর বাইরের ঘরে গভীর গবেষণায় কাটালাম। পরের দিন দুপুরেই ইউরোপ আমেরিকার সমস্ত বড় বড় রাজ্যে গোপন-কোডে টেলিগ্রাম ক'রে দিলাম স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীদের কাছে।

পনরো দিন পর্যন্ত ইউরোপ ও আমেরিকার নানা জায়গা থেকে অল্প-বিস্তর দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া গেল। আমাদের এশিয়া ও কাছাকাছি নানা জায়গা থেকেও কয়েকটা বিস্ফোরণের খবর এল। তারপর সব গেল শান্ত হয়ে। ইউরোপ ও আমেরিকার যে-কোন রেডিও খুললে এই ক'দিন প্রতি ঘণ্টায় একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তিই বার-বার শোনা যেত। প্রতি খবরের কাগজে ওই একই কথা। ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে দু'টি জাহাজ তখন এশিয়ার দিকে রওনা হয়েছে।

জাহাজ দু'টি এসে পৌঁছলো, ১৯৩৭ সালের ১৩ই ও ১৪ই সেপ্টেম্বর। সেইসঙ্গে আমেরিকা থেকে চারটি বিরাট আর্মি-প্লেনও আনিয়ে নিয়েছিলাম। ১৫ই সেপ্টেম্বর জাহাজ দু'টি থেকে সেই চারটি প্লেনে কয়েকটি বড়-বড় কাঠের বাক্স তুলে আমি ও মিঃ ডেভিস সকাল আটটায় রওনা হলাম। সন্ধ্যা-নাগাদ চারটি প্লেন যেখানে একসঙ্গে পৌঁছলো, আমাদের চার্ট দেখে বুঝলাম, তার দ্রাঘিমা ১২৫ ডিগ্রি আর অক্ষাংশ ৩৫ ডিগ্রি। বেতার ইঙ্গিতে সকলকে আদেশ জানাবার পর চারটি প্লেন থেকে কয়েকটি বড় বড় বাক্স সমুদ্রের ওপর ফেলে দেওয়া হ'লো।

মিঃ ডেভিস আর আমি দু'জনেই এতক্ষণ যেন কিসের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়েছিলাম। এতক্ষণে তিনি ধরা-গলায় বললেন, "সভ্য-জগতের সবচেয়ে বড় বিপদ বোধ হয় কেটে গেল!"

আমি একটু ম্লান-হেসে বললাম—"আপাততঃ!" ঘনাদা চুপ করলেন। গৌর উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করলে, "ওই বাক্সগুলোর মধ্যে কি ছিল ঘনাদা? ঘড়ি?"

"হ্যাঁ, দু'লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার তিনশো একটা ঘড়ি। ঘড়ি নয়, তার প্রত্যেকটা হ'ল এক-একটি ক্ষুদে অ্যাটম-বোমার সামিল। এমনভাবে সেগুলি তৈরি যে, কোনটি তিন দিন, কোনটি-বা তিন মাস ধরে দম দেওয়ার পরই তার গোপন দু'টি ক্ষুদে কুঠরি খুলে দিয়ে—টি. এন. টি.-এর চেয়েও সাংঘাতিক দু'টি রাসায়নিক পদার্থ একসঙ্গে মিশে যায়। এই মিশ্রণের ফলে যে বিস্ফোরণ হয়, তা অ্যাটম-বোমার মত না হ'লেও ডিনামাইটের চেয়ে অনেক বেশী প্রচণ্ড। যে-কোম্পানি এই ঘড়ি তৈরি করেছিল, সস্তা-দরে সমস্ত ইউরোপ আমেরিকায় এগুলি ছড়িয়ে দিতে তাদের কোন অসুবিধা হয়নি। কারখানার মজুর থেকে কেরানী উকিল ডাক্তার অনেকেই এ-ঘড়ি সস্তার লোভে অজান্তে কিনে হাতে পরেছে। তার ফলে দুই দেশের সর্বত্র অতর্কিত বিস্ফোরণ হ'তে শুরু করে। আর কিছু বেশী দিন এই ঘড়ি চালাতে পারলে ওসব দেশের অধিকাংশ কল-কারখানা, রেল, জাহাজ কিভাবে যে ধ্বংস হ'য়ে যেত কেউ তার হদিসই পেত না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাহ'লে আর দরকারই হ'ত না।

ইউরোপের বদলে ভুলক্রমে কয়েক বাক্স ঘড়ি যদি আমার কাছে না এসে প'ড়ত, সে-ঘড়ি আবার যদি চুরি না যেত, 'পালোলো'-উৎসবে ওইরকম রহস্যময় বিস্ফোরণ তার কয়েকদিন পরেই যদি না ঘটত, ঘড়ির কোম্পানির প্রতিনিধি ওই সামান্য সস্তা খেলো ঘড়ি ফেরত নেবার জন্যে প্লেনে ক'রে ছুটে আসবার মত গরজ যদি না দেখাত এবং সবচেয়ে যে ব্যাপারে আমার টনক নড়ে ওঠে,—আমার ম্যানেজার সেইদিনকার কাগজের একটি বিশেষ সংবাদের ওপর ঘড়িটি যদি না রেখে যেত, তাহ'লে এ দারুণ সর্বনাশা রহস্যের সমাধান করবার মত খেই আমি খুঁজে পেতাম না।

খবরের কাগজে ইউরোপের কয়েকটি কারখানার বিস্ফোরণের সংবাদের ওপর ঘড়িটা দেখবার পরই হঠাৎ এই সমস্ত ব্যাপারের

মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে ব'লে আমার মনে হয়। ডাঃ ডেভিসকে দিয়ে ঘড়িটা খুলে পরীক্ষা করবার পর আমি এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হই। নিরপরাধ পলিনেশিয়ান জেলেদের কেউ-কেউ না জেনে আমার কারখানায় চোরাই ঘড়ির কয়েকটা কিনেই উৎসবের দিনের ওই সমস্ত বিস্ফোরণের কারণ হয়, এ তখন আমার আর বুঝতে বাকি নেই।"

ঘনাদা এতক্ষণ চুপ ক'রে আর-একটা সিগারেট ধরাতেই শিশির বললে, "রেডিও আর খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েই তাহ'লে এই ঘড়িগুলো সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু এত জায়গা থাকতে ওই কত দ্রাঘিমা আর অক্ষাংশ বললেন, সেখানে এগুলো ফেলবার মানে কি?"

"মানে ম্যাপ খুললেই বুঝতে পারবে। স্থলভাগ থেকে যতদূরে সম্ভব এ সর্বনাশা জিনিস ফেলতে হবে ত'! ম্যাপে দেখতে পাবে, ওই জায়গার ধারে-কাছে একটা দ্বীপের ফুটকি পর্যন্ত নেই।"

"ওখানে ফেলার দরুন কোনো ক্ষতি তাহ'লে আর হয়নি?"—জিজ্ঞাসা করলে শিবু।

"না, তা আর বলি কি ক'রে!" হতাশভাবে বললেন ঘনাদা, "১৭ই সেপ্টেম্বরের টাইড্যাল-ওয়েভ আর সাইক্লোনের কথা ত' আগেই বলেছি। তার মূলে ত' ওই ঘড়ি।"

"কিন্তু এদিকে ঘড়িতে ক'টা বাজে জানো?" গৌর প্রায় আর্তনাদ ক'রে উঠলো, রেফারী এতক্ষণে বোধ হয় ফাইনাল হুইসল দিচ্ছে।

"অ্যাঁ!"—প্রায় সমস্বরে সবাই চিৎকার ক'রে উঠে ফ্যালফ্যাল ক'রে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

হাঁস

গৌর, শিশির, শিবু নয়, এ একেবারে বুনো বাপি দত্ত। যেমন গোঁয়ার তেমনি ষণ্ডা।

এ-হেন লোককে মেসে নতুন জায়গা দিয়ে কি ভুলই হয়েছে, সেদিন রাত্রে হাড়ে-হাড়ে বুঝে আমরা সবাই ইষ্টদেবতা স্মরণ করতে লাগলাম।

কুরুক্ষেত্রের বুঝি আর বাকি নেই। বিরাট-পর্ব শুরু হয়ে গেছে। প্রথম বোমা ফেটেছে।

বোমাটা ফাটল রাত্রের খাওয়া-দাওয়ার পর।

খাওয়া-দাওয়াটা বেশ ভালই হয়েছিল। মফঃস্বলে যাদের বাড়ি, তাদের কল্যাণে শুক্রবার রাত্রের খাওয়াটা আজকাল এই রকমই হয়। শুক্রবারের পরই শনিবার হাফ হলিডে-তে তাঁরা সকাল সকাল বাড়ি যান, আর ফেরেন সেই সোমবার সকালে। রবিবারের খ্যাঁটটার অভাব শুক্রবারের রাত্রের ভোজ দিয়েই তাঁরা তাই উশুল ক'রে নেন।

মফঃস্বলীদের মধ্যে বাপি দত্ত একজন। সাঁটিয়েদের ভেতরও।

তিনবারের জায়গায় চারবার চেয়ে খেয়ে যেভাবে সে পাত চাটছিল, ঘনাদা দেখলে বোধ হয় ঈর্ষ্যান্বিত হতেন। তাঁদের খাওয়ার রেষারেষির পাল্লায় ঠাকুর-চাকরের জন্য কিছু থাকত কিনা

সন্দেহ। কি ভাগ্যি ঘনাদা আজ শরীর খারাপ বলে—নয়, না খেয়ে নয়,—আগেই খেয়ে-দেয়ে তাঁর ঘরে চলে গেছেন।

পেতলের থালাটা মাজবার দায় থেকে লছমনিয়াকে প্রায় নিষ্কৃতি দিয়ে নিজের হাত চুষতে চুষতে বাপি দত্ত বললে,—"বাঃ চমৎকার!"

তা মাংসটা সত্যিই অপূর্ব রান্না হয়েছিল।

আঙুল চোষা শেষ ক'রে ঝকঝকে থালাটার দিকে একবার যেন করুণভাবে চেয়ে বাপি দত্ত বললে,—"কেমন, আমি বলি কিনা যে মাংস খেতে হয়ত' হাঁসের। ও মুরগী বল, পায়রা বল, হাঁসের কাছে কিছু না! যদি জাত বিগড়ি হাঁস হয়।"

"কেন উটপাখী হ'লে মন্দ কি!"—শিবু একটু ফোড়ন কাটল।

"উটপাখী! উটপাখী আবার খায় নাকি?"—বাপি দত্তর বুদ্ধিটা চেহারার-ই মাপসই।

"খেলে দোষ কি? একটাতে তোমারও কুলিয়ে যায়। অন্যদের জন্যেও মাংসের হাঁড়িতে টান পড়ে না।"—শিবু উৎসাহ দিলে।

একটু যেন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বাপি দত্ত বললে,—"না না, উটপাখী খাওয়াই যায় না, আর তা'ছাড়া হাঁসের তুলনা নেই—আসল বিগড়ি হাঁস! হাঁস আবার চেনা চাই।"

কথাটা বলেই বাপি দত্তর কি যেন মনে পড়ে গেল। ঠাকুরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে,—আজ হাঁস কিনে আনল কে, ঠাকুর?"

ঠাকুর আমাদের ভাল-মন্দ বাজার করে। সে কিন্তু সামনে এলেও নীরবেই দাঁড়িয়ে রইল।

"কই, কে কিনে এনেছে বললে না! তুমি?"

"আজ্ঞে না বাবু!"

"সে আমি জানতাম!"—বাপি দত্ত গর্বের হাসি হাসল। "এ হাঁস চিনে আনা তোমার কর্ম নয়। কিন্তু কিনে আনল কে?"

"আজ্ঞে, কিনে আমরা কেউ আনিনি।"

"তোমরা কেউ আননি! তাহ'লে বিগড়ি হাঁস কি নিজে থেকে

উড়ে এসে তোমাদের হাঁড়িতে ঢুকল নাকি! ন্যাকামি কোরো না। বলো!"

"আজ্ঞে, আপনিই কিনে এনেছেন!"—ঠাকুরকে সভয়ে বলতেই হ'ল।

"আমি কিনে এনেছি!"—খানিকক্ষণ বাপি দত্তের মুখ দিয়ে আর কথা সরলো না। তারপর আমরা টের পেলাম, পল্‌তেয় আগুন লেগেছে। "আমি মানে,—কাল বাড়িতে নিয়ে যাব বলে আমি যে ক'টা হাঁস কিনে রেখেছি, তাই কেটে রান্না হয়েছে! তাই তোমরা সবাই মিলে স্ফূর্তি ক'রে খেয়েছ আর আমায় খাইয়েছ!"

ঘরে কি বলে—আধুনিক কবিতার মত—শিশির পড়লে শোনা যায়।

এইবার বোমা ফাটল।

"কে? কে আমার হাঁস কেটেছে? কার এই শয়তানি আমি শুনতে চাই।"

আমাদের চোখ যার যার থালার ওপর। কিন্তু উত্তর না দিলে ঠাকুরের নিস্তার নেই।

"আজ্ঞে, বড়বাবু কেটেছেন।"

"বড়বাবু! বড়বাবু! বড়বাবু মানে তোমাদের সেই শুঁটকো মর্কট গেঁজেল চালিয়াৎ ঘনাদা!

হে ধরণী দ্বিধা হও—আমরা তখন ভাবছি।

কিন্তু ভাববার সময়ও পাওয়া গেল না।

সকড়ি হাতে এঁটো-মুখ না ধুয়েই বাপি দত্ত তখন সিঁড়ি দিয়ে রওনা হয়েছে ওপরে! আমাদের ছুটতে হ'ল পেছনে।

"আরে শোন! শোন দত্ত।"

কে কার কথা শোনে!

ছাদ পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই শুনতে পেলাম ঘনাদার ঘরের দরজা সারা পাড়াকে সজাগ করে সশব্দে আর্তনাদ করছে। বর্মা নয়, সি-পি'র সামান্য সেগুন কাঠ। তার আর কতটুকু জান!

বাপি দত্তকে এখন সামলানো বুনো মোষের মওড়া নেওয়ার চেয়েও শক্ত। তবু মরিয়া হয়ে তাকে ধরতে যাব, এমন সময় দরজা ভেতর থেকেই খুলে গেল।

"কি ব্যাপার!" ঘুম-চোখে যেন সদ্য বিছানা থেকে উঠে এসে হাই তুলে ঘনাদা বললেন,—"এতরাত্রে দরজায় টোকা কেন?"

টোকা শুনেই বোধ হয় বাপি দত্ত কাত। পাড়ার লোক যে-আওয়াজে ডাকাত পড়ার ভয়ে এতক্ষণে হয়ত' লালবাজারে ফোন ধরেছে, তার নাম টোকা!

কিন্তু ভেতরের বারুদ তখন জ্বলছে। বাপি দত্ত গর্জন ক'রে উঠল "কেন, আপনি জানেন না! কে আমার হাঁস কেটেছে?"

"আমিই কেটেছি।" ঘনাদা নির্বিকার।

"আপনিই কেটেছেন তা আমি জানি। নইলে এত বড় আস্পর্ধা কার হবে! কিন্তু কার হুকুমে, কোন্ সাহসে, আপনি আমার হাঁস কেটেছেন,—বাড়ি নিয়ে যাব ব'লে বাছাই ক'রে কেনা আমার চার চারটে হাঁস!—"

"চারটে ত' মোটে!—" ঘনাদা যেন দুঃখিত।

"ওঃ চারটে হাঁস কিছু নয় আপনার কাছে!—বাপি দত্ত আগুন।

"কিছুই নয়। এ-পর্যন্ত কেটেছি বারো শ' বত্রিশটা। আরো কত যে কাটতে হবে কে জানে!"—ঘনাদা তাঁর খাটের দিকে বিষণ্ণভাবে পা বাড়ালেন। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু তখুনি থামতে হ'ল।

"যাচ্ছেন কোথায়?" বাপি দত্ত হুংকার দিয়ে উঠল,—"আপনার ওসব গুল আমার কাছে ঝাড়বেন না। ওসব চালাকি আমি সব জানি।"

"জানো!" ঘনাদা যেন অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ফিরে দাঁড়ালেন। "জানো ঙগারুসেরচঙ্ কাকে বলে!"

"কি বললেন!"—বাপি দত্ত ক্ষিপ্ত।

"ঙগারুসেরচঙ্! তুমি নয়, হাঁসের নাম।" ঘনাদা আশ্বস্ত

করলেন, "জানো, তিনশ' সেরা শিকারী দুনিয়ার সমস্ত জলা জঙ্গলে এই হাঁস খুঁজে ফিরছে? জানো, একটা হাঁসের জন্যে গলায়-গলায় যাদের ভাব এমন দু' দুটো রাজ্য এ ওর গলা কাটতে পারে? জানো একটা হাঁসের পেট কেটে এই কলকাতা শহরটা কিনে নিয়েও যা থাকে, তাতে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ইজারা নেওয়া যায়!"

এই শেষের কথাতেই বাপি দত্ত কাবু। তবু গলাটা চড়া রেখেই শুধোলো,—"কি আছে সে হাঁসের পেটে? হীরে, মাণিক?"

"হীরে মাণিক!" ঘনাদা অবজ্ঞার হাসি হাসলেন, "এই বুদ্ধি না হ'লে হাঁস শুধু এতকাল খেতেই কেনো!"

"কি আছে তাহ'লে?"—বাপি দত্ত এবার উদ্‌গ্রীব।

"কি আছে?" ঘনাদা জুত ক'রে নিজের খাটের ওপর বসলেন। আমরাও যেখানে যেমন পারলাম বসলাম। শিশির সদ্য খাওয়া থেকে উঠে এসে সিগারেটের কৌটোটা আর সঙ্গে আনতে পারেনি। তার দিকে একটু ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘনাদা গম্ভীরভাবে বললেন,—"আছে একটা নস্যির কৌটো।"

"নস্যির কৌটো! আমি ভাবছিলাম কলকে বুঝি কিছুর!" বাপি দত্তর বিদ্রূপে কিন্তু আর তেজ নেই। খাটের ধারেই সেও জায়গা নিয়েছে।

ঘনাদার মুখে তীব্র ভ্রূকুটি দেখা গেল। "রাত ত' অনেক হয়ে গেল, এখন শুতে গেলে হয় না।" তিনি হাই তুললেন।

আমরা সন্ত্রস্ত, বাপি দত্ত নাছোড়বান্দা। "নস্যির কৌটো কেন?" চার চারটে হাঁসের শোক সে প্রায় ভুলেছে মনে হ'ল।

"কেন? উনিশ শ' পঁয়ত্রিশ সালের জুলাই মাসের সতেরোই তারিখে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু মালভূমিতে তুষার-ঝড়ে পথ হারিয়ে মরতে বসেছিলাম ব'লে, দুনিয়ার সেরা শয়তান ফন ক্রুল সদলবলে নেকড়ের পালের মত আমার পিছু নিয়েছিল ব'লে, প্রাণ যায় যাক, মান বাঁচাবার আর কোন উপায় ছিল না ব'লে, ষোল হাজার দশ ফুট উঁচু গুরলা গিরিদ্বারের তিন মাইল সোজা খাড়াই-এর পথে ভূত দেখেছিলাম ব'লে, আর বন্দুকের শেষ গুলিতে 'চাঙ্গু'টাকে মারতে পেরেছিলাম ব'লে!"

বাপি দত্তের মুখের হাঁ-টা আমাদের সকলের চেয়ে বড়।

কোনরকমে হাঁ বুজিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে "ভূত! ভূতের নাম চাঙ্গু? সেই ভূত গুলিতে মারলেন!"

"ভূত নয়, মারলাম চাঙ্গুটাকে। চাঙ্গু হ'ল ও-অঞ্চলে নেকড়ে

বাঘের নাম।” ঘনাদা যেন ক্লান্তভাবে একটু থেমে আবার বললেন,—“তোমরা ত’ হাত মুখও ধোওনি দেখছি।”

“হাত মুখ!” বাপি দত্তই সবার আগে রুমাল বার ক’রে হাত-মুখটা চটপট মুছে ফেলে বললে, “নেমন্তন্ন খেতে এসেছি মনে করলেই হয়! হ্যাঁ, তারপর শুনি।”

“তারপর নয়, তার আগে।” ঘানাদা শুরু করলেন—“কৈলাসটা চক্কর দিয়ে মানস সরোবর আর রাক্ষসতাল হয়ে টাকলাকোটে এসে তখন আটকে গেছি। টাকলাকোট ভারতে আসতে তিব্বতের শেষ গ্রাম। তার পরই বিপুলেখ গিরিদ্বার হয়ে ভারতে নামতে হয়। টাকলাকোটে এসেই শুনলাম বিপুলেখ গিরিদ্বার বরফ পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে। পারাপার হওয়া মানুষের অসাধ্য। অসময়ে আসার দরুন এ-ধরনের বিপদ যে হ’তে পারে তা অবশ্য আগেই জানতাম! মানস সরোবরের যাত্রীদের মরশুম অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। খাস তিব্বতীরাও এ অসময়ে শীত কাটাবার জন্যে তৈরী হয়ে গাঁ থেকে নড়ে না। টাকলাকোটের মোড়ল জানালে, শীতটা আমায় তাদের গাঁয়েই কাটাতে হবে। আপত্তি করলাম না। কাছাকাছি দেখবার শোনবার অনেক কিছুই আছে। দশ-বারো মাইলের মধ্যে সিম্বিলিঙ গুম্ফা, খেচরনাথ গুম্ফা ত’ বটেই, তা’ছাড়া কিছুদূরে গেলে এ-অঞ্চলে এখনও নাকি ‘ডং’ পাওয়া যেতে পারে। আর ‘ডং’ যদি না মেলে ত’ ‘গোয়া’ কি ‘তো’ কি ‘না আঁধিয়ান’ পেলেই বা মন্দ কি?”

শিবুর কাশির শব্দে ঘনাদা থামলেন। গৌর বললে,—“এই

সবে একপেট খেয়ে আসছি কিনা। মাথাটা কি রকম ঝিমঝিম করছে!"

একটু ভ্রূকুটি ক'রে ঘনাদা বললেন,—"ও, মাথায় ঢুকছে না বুঝি! আমারই দোষ। তিব্বতের কথা বলতে সেখানকার ভাষাই এসে যায়। 'গোয়া' আর 'চো' হ'ল ছোট আর বড় দু'জাতের তিব্বতী হরিণ আর 'না আঁধিয়ান' হ'ল সেখানকার বুনো ভেড়া।"

"আর 'ডং' বুঝি গাধা! ডংকি থেকে?"—বাপি দত্ত সোৎসাহে শুধোলে।

"আরে না! ডং গাধা হ'বে কেন?" ঘনাদা যেন বিশেষ তাৎপর্যের সঙ্গে বাপি দত্তের দিকে তাকালেন। "ডং হ'ল বুনো চমরী গাই। খুব কমই পাওয়া যায় আজকাল।

হ্যাঁ, টাকলাকোটে থাকি আর এদিক সেদিক বন্দুক নিয়ে শিকারে বেরোই। শীতটা সেবার একটু আগেই পড়েছিল। যেদিকে যাই শুধু তুষার আর তুষার। জন্তু-জানোয়ারও সব শীতের ভয়ে আগেই নিচে নেমে গেছে বোধ হয়। বেশীর ভাগ শুধু-হাতেই ফিরতে হয়।

এর মধ্যে একদিন খেয়াল হ'ল, এই শীতের দিনে গিরিদ্বার থেকে আর-একবার কৈলাস আর মানস সরোবর দে'খব। ভারতবর্ষ থেকে যেতে এই গুরলা গিরিদ্বার পার হবার সময়ই, প্রথম কৈলাস আর মানস সরোবরের দর্শন পাওয়া যায়।

মোড়ল মানা করলে। গুরলা গিরিদ্বার এখন বরফে মানুষের অগম্য। তা'ছাড়া আকাশের লক্ষণও নাকি ভাল নয়। তবু কে কার কথা শোনে। বারফু পর্যন্ত বারো মাইল একরকম নির্বিঘ্নেই গেলাম, তারপর কিছুদূর যেতে না যেতেই কোথায় আকাশ, কোথায় মাটি, আর খেয়াল রইল না। তিব্বতের তুষার-ঝড় যে কি বস্তু যে নিজের চোখে দেখেছে তারও বর্ণনা করতে ভাষায় কুলবে না। একেবারে প্রলয় কাণ্ড! ছেঁড়া ঘুড়ির মত সে ঝড়ে কখনও শূন্যে কখনও মাটিতে পাক খেয়ে—কোথায় গিয়ে যে পৌঁছলাম

জানি না। হাত-পাগুলো যে আস্ত আছে তাইতেই তখন অবাক্!"

শিবুর কাশিটা নিশ্চয়ই ছোঁয়াচে। এবার গৌর শিশির দু'জনে কাশি চাপতে গিয়ে বিষম খেয়ে কেলেঙ্কারি। ঘনাদার আগে বাপি দত্তই বিরক্ত হয়ে উঠল,—"কি সব কেশো-রুগী এখানে জুটেছে। হাসপাতালে গেলেই ত' পারো।"

কাশির রেশ মেলাবার আগেই ঘনাদা আবার ধরলেন, "কিন্তু অবাক্ হওয়ার তখনও বাকি আছে। তুষার-ঝড় যেমন হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে তেমনি হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়। গা ঝেড়ে-ঝুড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দেখি, চেনা কোন কিছুই চোখে পড়ছে না। এক একটা বড় বড় পাহাড় ছাড়া সবই যেন নতুন। তিব্বতের তুষার-তেপান্তরে হারিয়ে যাওয়া মানে যে কি, আমার চেয়ে ভাল ক'রে আর কে জানবে। দশ-দিন দশ-রাত হেঁটে, মানুষের আস্তানা খুঁজে পাওয়া অসাধ্য। আর দশ-দিন দশ-রাত টিকলে ত'! সঙ্গে ত' মাত্র দিন দুয়েকের রসদ ছিল, তাও ঝড়ে কোথায় গেছে ছড়িয়ে। আছে শুধু হাতের বন্দুকটি। তবু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। যে কোন দিকে যাবার চেষ্টা করতেই হবে। পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ চম্‌কে উঠলাম।

ঝড়ের ঝাঁকানিতে শেষে মাথাই খারাপ হ'য়ে গেল নাকি! ন'ইলে এ অদ্ভুত ব্যাপার কি ক'রে সম্ভব?

সেই জনমানবহীন ধু-ধু তুষার-প্রান্তরে বিশুদ্ধ "ফিনিস" ভাষায় কে ডাকছে—কে আছ কোথায়? কাছে এস, আমার কথা শুনে যাও।

গায়ে কাঁটা দিয়ে শির-দাঁড়াটার ভেতর শির্‌শির ক'রে উঠল। যে দিকে চাই কোথাও মানুষ দূরে থাক একটা কাক-পক্ষীও ত' নেই।

খানিক চুপ করার পর আবার সেই ডাক এল। এবার ফরাসীতে।

নিজের গায়ে চিমটি কাটলাম। সাতানব্বই হাজার সাতশ'

সাতান্নকে একাশী হাজার ন-শ' বাইশ দিয়ে গুণ করলাম মনে মনে। না মাথা ত' খারাপ হয়নি একেবারে। এ অশরীরী আওয়াজ তাহ'লে কেমন ক'রে শুনছি ?

আবার সেই ডাক। এবার ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে। আশ্চর্য এ-গলা যে খানিকটা চেনাই মনে হচ্ছে। কিন্তু তাই বা কি ক'রে হ'তে পারে! সাত বছর বাদে এ-গলা ত' শোনবারই কথা নয়!
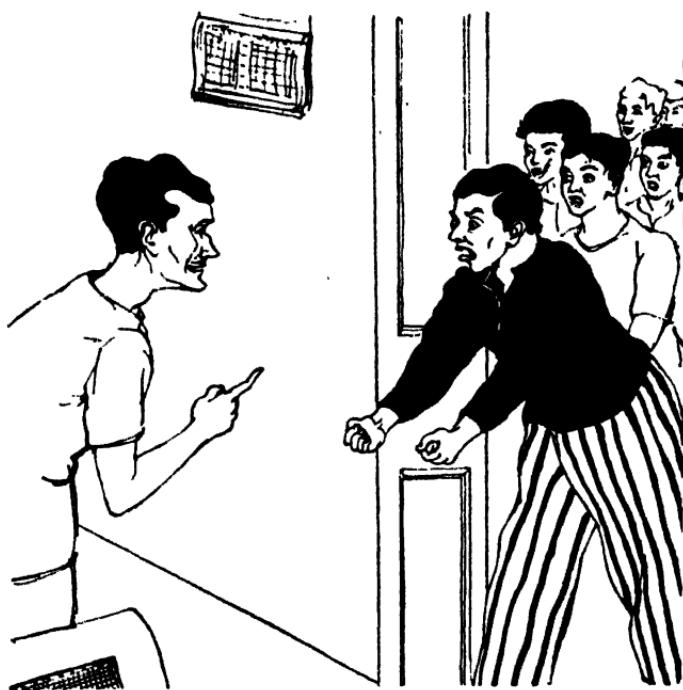
মিনিট কয়েক থেমেই ঘুরে ঘুরে সেই ডাক আসছে। যেদিক থেকে ডাকটা আসছিল সেই দিকেই এবার গুটি-গুটি এগুলাম। কোথাও কোন একটা ছায়া পর্যন্ত নেই। শুধু থেকে থেকে ওই আওয়াজ।

খানিক দূর গিয়েই একেবারে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ঝুরো-তুষারে প্রায় অর্ধেক ঢাকা একটা মানুষের দেহ।

এ কি! এ যে সত্যই ডাঃ ক্যালিও—ফিনল্যাণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। সাত বছর আগে সিনকিয়াং থেকে তিব্বতে যাবার পথে দস্যুদের হাতে যিনি মারা পড়েছেন ব'লে সবাই আমরা জানি! তাঁর তিব্বতে যাওয়ার খেয়াল নিয়ে তখন লেখালেখিও হয়েছিল অনেক কাগজে।

এবার ব্যাকুলভাবে সেখানে বসে প'ড়ে ডাঃ ক্যালিওর দেহটা পরীক্ষা করলাম। না, সাত বছর আগে মারা না পড়লেও অন্ততঃ সাত দিন আগে যে তিনি মারা গেছেন এবিষয়ে সন্দেহ নেই। বরফের দেশ ব'লে দেহটা তেমন বিকৃত হয়নি। পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ রাসায়নিকের এর চেয়ে বুঝি সাত বছর আগে দস্যুর হাতে মারা যাওয়াই ভাল ছিল। এই তুষার-প্রান্তরে তিল তিল ক'রে মরতে কি কষ্টই না পেয়েছেন, কে জানে!

পর মুহূর্তেই শরীরের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠল। ডাঃ ক্যালিওর গলার স্বরে সেই ডাক আবার। তুষার-ঢাকা নিস্তব্ধ প্রান্তরে সে ডাক কোথা থেকে আসছে? সভয়ে চেয়ে দেখলাম তাঁর মৃতদেহ থেকে অন্ততঃ নয়।

উন্মাদ ক'রে দেবার মতই অলৌকিক ভয়াবহ ব্যাপার। মাথা ঠাণ্ডা রাখতেই হবে। তা রাখতে না পারলে আর সহজ-সুস্থ মানুষ হিসেবে সেখান থেকে ফিরতে হ'ত না, আর তারপর ফন ক্রুলের সন্ধানও পাওয়া যেত না।

গুরলা গিরিদ্বারের প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে এই দুর্দান্ত শীতে ফন ক্রুল একান্ত নির্জনে সদলবলে তার ছাউনি যেখানে গেড়েছে সেখানে কয়েকদিন বাদে সকালে এক পথ-হারানো 'ডোক্‌পা'—মানে রাখাল গিয়ে হাজির। তুষার-ঝড়ে তার সব খোয়া গেছে। উপোসে ঠাণ্ডায় সে আধমরা। একপাল চমরী আর ঝাব্বুস অর্থাৎ ভারতবর্ষের গরু আর তিব্বতের চমরী মেশানো পশু নিচের টাকলাকোটে পৌঁছে দিয়ে, সে দু'জন বন্ধুর সঙ্গে কিছু রসদ নিয়ে

যুগোলো গুম্ফায় ফিরছিল! মাঝে তুষার-ঝড়ে কে কোথায় গেছে সে জানে না।

ফন ক্রুল যেমন শয়তান তেমনি চৌকস। তিব্বতী ভাষা সে ভাল ক'রেই জানে। সামান্য একটা তিব্বতী রাখাল হ'লেও তবু নানারকম প্রশ্ন ক'রে 'ডোক্‌পা'কে পরীক্ষা ক'রে তবে তাকে ছাউনিতে ঠাঁই দিলে। ছাউনি মানে গোটা পাঁচ-ছয় তাঁবু। কিন্তু তিব্বতের শীতের সঙ্গে যোঝবার মত ক'রে তৈরি। একটিতে থাকে ক্রুল নিজে, আর একটিতে তার অনুচরবৃন্দ আর রসদ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। অনুচরের ভেতর তিব্বত লাদক সিনকিয়াং সব জায়গার লোকই আছে।

'ডোক্‌পা' লোকটা কাজের। একদিন খেয়ে দেয়ে একটু চাঙ্গা হয়েই শুধু কাজের গুণে সে ক্রুলের নজরে পড়ে গেল। তাঁবু পরিষ্কার বন্দুক সাফ থেকে সাহেব-সুবোর হেন কাজ নেই সে জানে না।

দু'দিন বাদে তাকে দিয়ে হ্যাসাক বাতি সাফ করাতে করাতে ক্রুল হঠাৎ একটা বুটের ঠোক্কর দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—"এই বেটা ভূত! এ সব সাহেব-সুবোর কাজ শিখলি কোথায়?"

"আজ্ঞে, হেডিন সাহেবের সঙ্গে ছিলাম যে ক'বার।"

"হেডিন সাহেব!"—ক্রুল অবাক্। "কে হেডিন?"

"আজ্ঞে গরীবের মা-বাপ সোয়েন হেডিন।"

ক্রুল সাহেব এবার যেন একটু হতভম্ব। "সোয়েন হেডিনের সঙ্গে তুই কাজ করেছিস্। তিব্বতের এ-অঞ্চল ত' তুই তা'হলে জানিস্ কিছু?"

"আজ্ঞে তা আর জানি না। এমন সব পাহাড়, নদী, হ্রদের খবর রাখি এদেশের লোকেরাও যার নাম জানে না।"

"বেশ বেশ। তোকে আমার কাজে লাগবে।" ব'লে ক্রুল বেরিয়ে গেল, তার পরদিন তাঁবু উঠিয়ে নতুন পথে রওনা হবার ব্যবস্থা করতেই বোধ হয়।

পরের দিন পর্যন্ত ক্রুলকে অপেক্ষা করতে হ'ল না।

সেদিনই বিকেলের দিকে কাছাকাছি বুঝি শিকারে গেছল একটু। সন্ধ্যের পর ফিরে এসে ঘরে 'ডোক্‌পা'কে দেখে একটু বিরক্তই হয়ে উঠল।

"কি করছিস্ কি এখানে এখন, ভূত কোথাকার!"

হ্যাসাক বাতিটা তুলে এদিকে ওদিকে ঘোরাতে ঘোরাতে 'ডোক্‌পা' বললে,—"আজ্ঞে, একটা জিনিস খুঁজছি।"

"জিনিস খুঁজছ! হতভাগা জানোয়ার! এটা তোমার জিনিস খোঁজবার সময়! কি খুঁজছ কি?"

"আজ্ঞে, একটু জল।"

'জল!'—প্রথমটা ক্রুল হাসবে না রাগবে ঠিক করতে পারল না। তার পর-মুহূর্তেই তার প্রকাণ্ড বাঘের মত মুখখানা লাল হয়ে উঠল রাগে। হুংকার দিয়ে বললে—"কি এখানে খুঁজছিস্?"

"আজ্ঞে একটু ভারী জল, ডিউটেরিয়াম অক্সাইড।"

পায়ের তলায় হঠাৎ পৃথিবীটা সরে গেলেও ক্রুল বোধ হয় এমন চম্‌কে উঠে ফ্যাকাশে মেরে যেত না। সামলাতে তার কিন্তু বেশীক্ষণ লাগল না। "তবে রে শয়তান! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা!" বলে পাক্কা সাড়ে ছ' ফুট দু'-মণী লাশটা নিয়ে 'ডোক্‌পা'র ওপর এবার সে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অতবড় লাশটা ত' আর চারটিখানি কথা নয়! একদিকের দড়ি ছিঁড়ে তাঁবুর একটা কোণ ঝুলে পড়ল।

হ্যাসাক বাতিটা একটু সরিয়ে রেখে বললাম,—"তাঁবুটা বড়ই ছোট। এর মধ্যে অত লাফালাফি দাপাদাপি কি ভাল!"

বাপি দত্ত হঠাৎ লাফ মেরে উঠল উত্তেজনায়—"ও! আপনিই তাহ'লে 'ডোক্‌পা'! আমিও তাই ভাবছিলাম 'ডোক্‌পা'টা এল কোথা থেকে।"

করুণামিশ্রিত অবজ্ঞার সঙ্গে বাপি দত্তের দিকে একবার চেয়ে ঘনাদা আবার শুরু করলেন,—"গা-টা ঝেড়ে-ঝুড়ে উঠে ক্রুল বেশ একটু হতভম্ব হয়েই আমার দিকে এবার তাকাল। যা শিক্ষা

ওইটুকুতেই হয়েছে তাতে, গায়ের জোর পরীক্ষা করবার উৎসাহ আর তার তখন নেই। কিন্তু ভেতরের জ্বালা যাবে কোথায়! গলা দিয়েই সেটা বেরুল আগুনের হুঙ্কার মত।"

"কে তুই! কি মতলবে এখানে ঢুকেছিস্?"

"বললাম ত', শুধু একটু ভারী জলের খোঁজে। একশিশি যে-জল এই হাইড্রোজেন বোমার যুগে বেচলে সারা-জীবন পায়ের ওপর পা দিয়ে কাটিয়ে দেওয়া যায়। ডাঃ ক্যালিও প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে এই সুদূর তিব্বতে এসে, যে ভারী জলের এমন স্বাভাবিক এক গুপ্ত হ্রদ খুঁজে পেয়েছেন, পিপে পিপে চালান দিলেও যা একশ' বছরে ফুরোবে না। ডাঃ ক্যালিও কাজ সেরে দেশে ফেরবার মুখে নিরীহ সাধারণ পর্যটক ভেবে যে জলের হ্রদ আবিষ্কারের কথা তোমার মত শয়তানকে বলেছিলেন, আর ডাঃ ক্যালিওর কাছে যে জলের হ্রদের গুপ্ত মানচিত্র কেড়ে নিয়ে তাঁকে তুষার-ঝড়ের মধ্যে একলা মরতে ছেড়ে দিয়ে তুমি এখন হ্রদের সন্ধানে চলেছ।"

"এসব কথা তুই জানলি কি করে!"—রাগে বিস্ময়ে ক্রুলের গলাটা তখন কাঁপছে।

"জানলাম ডাঃ ক্যালিওর কাছে।"

"হতে পারে না!"—ক্রুল চেঁচিয়ে উঠল, "ডাঃ ক্যালিওকে কথা বলবার অবস্থায় আমি রেখে আসিনি।"

"তাই নাকি!" শয়তানের নিজের মুখের এই স্বীকারটুকুই চাইছিলাম।

"কোথা থেকে তুই জানলি আগে বল।"—ক্রুল পারলে আমায় ছিঁড়ে খায়।

"তাহ'লে শোন। জানলাম ডাঃ ক্যালিওর ভূতের কাছে!"

"ভূতের কাছে!"—ক্রুল বুঝি ক্ষেপেই যায়।

হেসে বললাম,—"হ্যাঁ, ভূতের কাছে। আর জেনেছি যে ঠিক, তাতে কোন সন্দেহ আছে কি?"

"কিন্তু জেনে তোর লাভ কি!"—হঠাৎ ক্রুল তাঁবুর ধারে রাখা

তার বন্দুকটা তুলে নিয়ে আমার দিকে উঁচিয়ে, তার চাল আর গলা দুই-ই পালটে ফেললে—"এ জলের হ্রদ কি তুই কখনো খুঁজে পাবি ভেবেছিস্? আর পেলেও তোর মত কালা মর্কটের কাছে ও জল কিনত কে?"

বিদ্রূপের হাসি হাসতে গিয়ে হঠাৎ ক্রুল থমকে আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল। টুপিসমেত মাথার চুলটা আর তিব্বতীদের চেহারার ধরনের সামান্য যে-কটা দাড়ি গোঁফ মুখে ছিল তা আমি তখন খুলে ফেলেছি।

"দাস!"

"হ্যাঁ মূলার, সেই দাস, তোমার সঙ্গে অনেকদিনের বোঝাপড়া যার বাকি। ডাঃ ক্যালিও, তোমায় নিরীহ ক্রুল বলেই জেনেছিলেন। কিন্তু আমি তোমার আসল পরিচয়টা ভুলিনি,—বিজ্ঞানের কলঙ্ক, জালিয়াৎ, খুনে, ফাঁসির আসামী, জেল-পালানো—মূলার! জীবনের প্রথমে ল্যাবরেটরির রেডিয়াম চুরি করে ধরা পড়ার পর অনেকবার যে নাম পালটেছে সে-ই!"

মূলার এবার সত্যিই হো হো করে হেসে উঠল—"যাক, ভালই হয়েছে দাস, নিজে থেকে এ-সুযোগটা আমায় দিয়েছ বলে। মূলার নামটা যারা ভোলেনি তাদের সংখ্যা আমি কিছু কমাতে চাই।"

মূলার বন্দুকটা আমার দিকে বাগিয়ে ধরল।

হেসে বললাম,—"শিকার করে ত' এই ফিরলে, বন্দুকে আর টোটা আছে কি?"

হিংস্রভাবে হেসে মূলার জবাব দিলে,—"আছে একটাই আর সেই একটাই তোমার মত মর্কটকে মারবার পক্ষে যথেষ্ট।"

"কিন্তু মর্কট মারা গেলে ভারী জলের হ্রদ আর খুঁজে পাবে কি?"

"পাব না মানে?" রাগে খিঁচিয়ে উঠলেও মূলারের চোখ দেখে বুঝলাম সে অত্যন্ত বিচলিত হয়েছে।

"সে ম্যাপ—ম্যাপ তুই চুরি করেছিস্ ?"—রাগে মূলার প্রায় তোতলা।

"নইলে কি শুধু তোমার খিদ্‌মতগারি করতে এ-তাঁবুতে ঢুকেছি! আরে সামলে সামলে! আমায় মারলে ম্যাপ পাবে কোথায়! সে কি আমার বুক পকেটে তোমার সুবিধের জন্যে রেখে দিয়েছি!"

"কোথায় রেখেছিস্ ? তবু মূলার বন্দুকটা বুঝি ছুড়েই দেয়।

"বলব, কিন্তু হ্রদের জলে আমার আধা বখরা চাই।"

"আধা বখরা!"—মূলার চট করে কি ভেবে নিয়ে বললে, "তাই সই। কোথায় ম্যাপ্ ?"

"বলছি বলছি, অত ব্যস্ত কেন ? আগে বখরাটা কি রকম শোনো!"

"কি রকম ?"

"যে শিশিতে এ জল চালান যাবে সেইটে তোমার, জলটা আমার!"

"কি!" এই অবস্থায় এই ঠাট্টায় একেবারে চিড়্‌-বিড়িয়ে উঠে মূলার এক পলকের জন্যে বুঝি একটু অসাবধান হ'ল।

একহাতে বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে আর একহাতে হ্যাসাক বাতিটা আছড়ে ফেলে আমিও তৎক্ষণাৎ তাঁবু থেকে ছুট।

হ্যাসাক বাতিটা বৃথাই পড়েনি। ছুটতে ছুটতে দূর থেকে ফিরে দেখলাম তাঁবুগুলো দাউ দাউ করে জ্বলছে।

কিন্তু মূলারের মত শয়তানকে যে ওইটুকুতে ঠেকান যায় না পরের দিন সকালেই তা টের পেলাম।

তিব্বতের মত উঁচু মালভূমির পাতলা হাওয়ায় প্রাণপণ ছুটে, ক্লান্তিতে ক্ষিদেয় সত্যিই তখন আমার অবস্থা কাহিল। সেই অবস্থায় মাঝারিগোছের একটা তুষার-চূড়োর ওপর উঠে চারিদিক দেখতে গিয়ে বুকটা হঠাৎ ধ্বসে গেল।

পিঁপড়ের মত হ'লেও বহুদূরে একটা চলন্ত প্রাণী দেখা যাচ্ছে। সেটি আর কিছু নয়—মূলার স্বয়ং—আর তার পায়ে স্কি। শয়তানটা যে সঙ্গে স্কিও এনেছিল এইটিই ভাবতে পারিনি। শুধু পায়ের

দৌড়ে তার সঙ্গে আর কতক্ষণ পারব! হাতের বন্দুকটা ভার হ'লেও ফেলে দিতে ত' পারি না।

প্রাণও যদি যায় এ ম্যাপ মূলারকে পেতে দেব না। এই পণ করে খোলা প্রান্তর ছেড়ে এবার পাহাড়ের গায়ে গায়ে যেতে লাগলাম। কিন্তু ক্ষিদেয় যে বত্রিশ নাড়িতে পাক দিচ্ছে! পেটে কিছু না পড়লে আর ত' দাঁড়াতেই পারব না।

হঠাৎ পাহাড়ের একটা বাঁক ঘুরেই হাতে যেন স্বর্গ পেলাম। সামনের একটা চূড়োর ওপর ক'টা 'ঙগারুসেরচঙ' মানে ব্রাহ্মিনী বালিহাঁস। শীতের সময় ভারতের গরমে সব জলায় উড়ে যাবার পথে বোধ হয় বিশ্রাম করতে নেমেছে। বন্দুকে একটামাত্র গুলি, কিন্তু তাতেই আহারের সমস্যা মিটে যাবে মনে করার সঙ্গে-সঙ্গেই আরেকটা মতলব বিদ্যুতের মত মাথায় খেলে গেল।

কিন্তু গুলি না করে হাঁস ধরি কি করে!

সে সমস্যা ভাগ্যই মিটিয়ে দিলে। চম্‌কে দেখি পাহাড়ের অন্যধার দিয়ে নিঃশব্দে একটা 'চাঙ্কু', মানে নেকড়ে বাঘ ওই হাঁসের লোভেই গুঁড়ি-মেরে এগিয়ে আসছে। দুরু-দুরু বুকে বন্দুক বাগিয়ে বসে রইলাম। পাঁচ, দশ, পনরো সেকেণ্ড, নেকড়েটা ঝাঁপিয়ে হাঁস ধরবার সঙ্গে সঙ্গেই গুলি। নেকড়েটা লুটিয়ে পড়ল মরে, আর তার মুখ থেকে গড়িয়ে পড়ল, ভয়েই-আধমরা অজ্ঞান হাঁসটা।

ছুটে গিয়ে হাঁসটা তুলে নিলাম। না, জখম কিছু হয়নি, শুধু ভয়েই অসাড়। দেখতে দেখতেই সাড় ফিরল তার, আর ম্যাপটা পাকিয়ে দলা করে যার মধ্যে রেখেছিলাম সেই ছোট কৌটাটা তার মুখে পুরে দিয়ে বেশ করে ঝাঁকুনি দিলাম। কোঁৎ করে হাঁসটা সে কৌটোটা গিলে ফেলতেই—তাকে শূন্যে দিলাম ছুঁড়ে। পড়-পড় হয়ে দু'বার পাখা ঝাপটা দিয়েই সে দূর আকাশে উধাও হয়ে গেল। বুঝলাম হিমালয় পার না হয়ে আর সে থামবে না। সে হাঁস এই ভারতবর্ষের না হোক, দুনিয়ার কোন-না-কোন জলায় শীতকালে আসেই। আজো তাকে তাই খুঁজছি। ক'জন বড় বড় বৈজ্ঞানিককে

গোপনে একথা জানিয়েছি। তাঁদের ভাড়া করা অন্ততঃ তিন শ' শিকারীও এই খোঁজে ফিরছে।

"তাহ'লে এখনও হাঁসটা পাওয়া যেতে পারে?"—বাপি দত্ত উৎসাহিত।

"আলবত পারে।"—ঘনাদা নিঃসংশয়।

"কিন্তু মূলার কি করলে? বন্দুকের শব্দ পেয়েও আপনাকে ধরতে পারলে না?"—শিশির যেন সন্দিগ্ধ।

"তা পারল বই কি? আর তাই তার কাল হ'ল। হাঁস উড়িয়ে দিয়ে লুকিয়ে পালাবার চেষ্টাতেই ছিলাম। কিন্তু তার আর তখন উপায় নেই। চেয়ে দেখি স্কি-তে চড়ে সে একেবারে পাহাড়ের তলায় পৌঁছে গেছে। স্কি ছেড়ে সে ওপরে উঠতে শুরু করল এবার। আমার হাতে খালি বন্দুক, তার হাতে গুলি-ভরা। চূড়োর এমন জায়গায় আছি যে লুকোবারও উপায় নেই। ক্রমশঃই সে এগুচ্ছে। আর একটু উঠলেই অনায়াসে গুলি করতে পারবে। খালি বন্দুকটাই তার দিকে ছুঁড়ে মারলাম। সেটা বেয়াড়া একটা পাথরে ঠোক্কর খেয়ে একরাশ তুষার-গুঁড়ো উড়িয়ে সশব্দে নিচে গিয়ে পড়ল। তাকে ছুঁতেও পারল না।

কি পৈশাচিক তার আনন্দের হাসি তখন।

আর উপায় নেই। নড়াবার মত একটা পাথরও নেই কাছে। বরফও ঝুরো।

নিচে মূলার তখন ভাল করে বন্দুক বাগিয়ে ধরে তাগ করছে।

বন্দুকের গুলি তার ছুটল, কিন্তু একটু দেরিতে। মূলার তখন খাড়া পাহাড় দিয়ে তুষার-গুঁড়োর সঙ্গে গড়াতে গড়াতে নিচের বরফের নদীর মধ্যেই কবর হতে চলেছে। তার সঙ্গে সেই 'চাঙ্গু' মানে নেকড়েটাও। সেইটেরই লাশটা শেষপর্যন্ত কিছু না পেয়ে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম।"

ঘনাদা থামতেই গৌরের বেয়াড়া প্রশ্ন—"আচ্ছা নস্যির কৌটো পেলেন কোথায়? নস্যি নিতেন নাকি তিব্বতে?"

"নস্যির কৌটো বলেছি বলেই তাই না। ফিল্ম যাতে থাকে সেই ছোট আলুমিনিয়ামের কৌটো। মূলারের তাঁবুতেই পেয়েছিলাম।"

এবার বাপি দত্ত আসল কথাটা তুলল, "ভাগ্যিস ডাঃ ক্যালিওর ভূত আপনাকে ডেকেছিল। তার কাছেই ত' সব জানতে পারেন ?"

"তা ভূতই বলতে পারো, তবে আসলে জিনিসটা একটা টেপ রেকর্ডার।"—ঘনাদা মুখ টিপে হাসলেন।

"টেপ রেকর্ডার !" আমরাও অবাক্।

"হ্যাঁ, ডাঃ ক্যালিও জন্তু-জানোয়ার থেকে পাখি-টাখির আওয়াজ ও তিব্বতীদের কথাবার্তা তুলে নেবার জন্যে ওটি সঙ্গে রাখতেন। শেষপর্যন্ত মূলারের মতলব বুঝতে পেরে ওই যন্ত্রটি কাজে লাগাবার অদ্ভুত ফন্দি বার করেন। নিজের সব কথা ওই যন্ত্রে তুলে নিয়ে ওইটিই লুকিয়ে এক জায়গায় রেখে আসতে পেরেছিলেন মারা যাবার আগে, যন্ত্রটির এমন প্যাঁচ করেছিলেন যে ফিতেটা নিজে থেকেই একবার গুটিয়ে যায়, একবার খুলে যায়—কথাগুলোও ঘুরে ঘুরে শোনা যায়। আওয়াজ ধরে আমি যন্ত্রটা খুঁজে বার করি একটা পাথরের তলায়। অন্য ক'টা ফিতে থেকে বাকি কথাগুলোও কিছুটা জানতে পারি। কিন্তু যন্ত্রটা বরফের গুঁড়ো ঢুকে, ঝড়ের ধাক্কায়, পাথরে ঠোকাঠুকি খেয়ে, প্রায় তখন বিকল হয়ে এসেছে। আমি কিছুটা চালাতেই একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।"

"ফিতেটা খুলে সঙ্গে আনলে পারতেন ! বুনো হাঁসের পেছনে ধাওয়া করার দরকার হ'ত না।"—শিবুর কেমন বাঁকা মন্তব্য।

ঘনাদা কিছু বলবার আগে বাপি দত্তই শিবুর ওপর মারমুখো হয়ে উঠল।—"আনবার হ'লে আর ঘনাদা আনতেন না, আহাম্মক !"

বলা বাহুল্য বাপি দত্তই সেই থেকে ঘনাদার সবচেয়ে বড় ভক্ত।

হাঁস খেতে খেতে আমাদের অরুচি ধরে গেল।

সুতো

না, এবারে অবস্থা একেবারে সঙিন। খবরের কাগজের ভাষায় যাকে বলে সঙ্কটজনক পরিস্থিতি।

অন্ততঃ আমাদের বুদ্ধিতে আর কূল পাওয়া যাচ্ছে না।

একে একে সব কলা-কৌশলই আমরা প্রয়োগ করেছি, কিন্তু সবই বৃথা।

কঞ্চির তীরের মত আমাদের সব ফন্দি-ফিকির এক দুর্ভেদ্য বর্মে ঠেকে নিষ্ফল হয়ে গেছে।

প্রথমে গৌর, তারপর আমি এবং আমাদের পরে শিবু ও শিশির হতাশ হয়ে ফিরে এসেছে। ঘনাদাকে তাঁর ঘর থেকে নিচে নামাতে পারিনি।

আজ সাতদিন ধরে তিনি স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়েছেন নিজের তেতলার ঘরে।

রামভুজ দু'বেলা খাবারের থালা পৌঁছে দিয়ে আসে। উদ্ধব জলের কুঁজো ভরে দিয়ে এসে সে-থালা যথারীতি রোজ দু'বার নামিয়ে আনে।

ব্যস্। মেসের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক ঘনাদার নেই।

আমরা চেষ্টার ত্রুটি করিনি। কিন্তু ঘরের দরজাই না খুললে

বাইরে থেকে কত আর কৌশল প্রয়োগ করা যায়। দরজায় টোকা দিয়ে তবু ডেকেছি,—"শুনছেন ঘনাদা!"

কোন সাড়া নেই প্রথমে। বারকয়েক ডাকের পর ভেতর থেকে একটা আওয়াজ শোনা গেছে যার মধ্যে অভ্যর্থনার বাষ্পও নেই!

"কে?"

প্রশ্নটা অর্থহীন, কারণ আমাদের সকলের গলাই ঘনাদার ভালরকম চেনা। তবু সবিস্তারে পরিচয় দিয়ে শিবুই হয়ত' জানায়—"আজ্ঞে, আমি শিবু। আপনার সঙ্গে বিশেষ একটু দরকার ছিল।"

"পরে এসো।"

মুশকিল ওইখানেই। ঘনাদা অন্য কিছু ব'লে বিদায় করতে চাইলে তবু উপরোধ-অনুরোধ করা যায়। তিনি যদি রাগ দেখান, তাতেও ক্ষমা চেয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করা যায়, 'কিন্তু পরে এসো' বলবার পর বেশীক্ষণ তা নিয়ে আর সাধাসাধি চলে না।

পরে এসেও অবশ্য তাঁর দরজা খোলা পাওয়া যায় না। হয় তিনি ঘুমোচ্ছেন, নয় বাথরুমে গেছেন।

নিরুপায় হয়ে, শেষে রামভূজের সঙ্গেই সেদিন রাত্রে তাঁর ঘরে ঢুকে পড়লাম। একটু চালাকি অবশ্য করতে হয়েছিল। দু' বেলা রামভুজ এসে "বড়বাবু, খাবার আনিয়েছি" বলে ডাকলে তিনি দরজা খুলে দেন। আমরা একেবারে নিঃশব্দে রামভুজের পেছন পেছন এসে সেদিন দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে গেছি।

দরজা খোলার পর রামভুজ মেঝের ওপর থালা বাটি সাজাচ্ছে এমন সময়ে আমাদের প্রবেশ।

ঘনাদা আসনে বসে সবে গেলাসের জলে হাতটা ধুয়ে মহাযজ্ঞের জন্য তৈরী হচ্ছেন, এমন সময় আমাদের ক'জনকে দেখে মুখে তাঁর আষাঢ়ের মেঘ নেমে এসেছে।

শিশির তখন তাঁকে দেখিয়ে দেখিয়েই নতুন সিগারেটের টিনটা ঢাকনা ঘুরিয়ে খুলে হাওয়া ঢোকবার আওয়াজটুকু পর্যন্ত শুনিয়ে

দিয়েছে। শিবু যেন রেগে গিয়ে রামভুজকেই বকতে শুরু করেছে,—"তোমার কি রকম আক্কেল ঠাকুর! ওইটুকু বাটিতে ঘনাদার জন্যে মাংস এনেছ! কেন আর বড় বাটি নেই মেসে?"

তা, যে বাটিতে ঘনাদাকে মাংস দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে বড় বাটি অবশ্য ফরমাশ দিয়ে না গড়ালে বোধ হয় পাওয়া মুশকিল।

কিন্তু হায়, সবই বৃথা!

ঘনাদা আমাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত না করে রামভুজকেই উদ্দেশ করে বলেছেন,—"এ সব নিয়ে যাও রাজভুজ! আমি আজ আর খাব না।"

আমরা হতভম্ব। রামভুজও তথৈবচ। তবু তার মুখেই প্রথম কথা বেরিয়েছে,—"খাইবেন না, কি বলছেন বড়বাবু! আজ ভালো মটন আছে। হামি কোপ্তা কারি বানিয়েছি।"

ঘনাদা আড়-চোখে একবার মাংসের বাটিটির দিকে চাইলেও নিজের সংকল্পে অটল থেকেছেন।

"না, আমার খাবার উপায় নেই।"

"উপায় নেই! হঠাৎ হ'ল কি?"—আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে সবিস্ময়ে!

ঘনাদা রামভুজকেই শুনিয়ে বলেছেন,—"কারুর সামনে আমার খাওয়া বারণ, তুমি ত' জানো।"

রাজভুজ কি জানে তা আর আমরা যাচাই করবার জন্যে অপেক্ষা করিনি। সবাই তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এসেছি অপ্রস্তুত হয়ে। ঘনাদার একথা শোনার পর আর সেখানে থাকা যায়!

সেই থেকে আজ সাতদিন হ'ল ঘনাদার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

ঘনাদার রাগটা এবার একটু বেশী এবং তা নেহাত অকারণেও নয়। আমাদের রসিকতাটা এবার বোধ হয় মাত্রা একটু ছাড়িয়েও গেছল।

কিন্তু সব দোষ ত' আসলে সেই বাপি দত্তের।

হাঁস খাইয়ে খাইয়ে আমাদের পাগল করে না তুললে তাকেই অমন একদিন ক্ষেপে গিয়ে মেস ছাড়তে হয়, না ঘনাদা আমাদের সঙ্গে সব সম্বন্ধ ঘুচিয়ে দেন!

বাপি দত্ত দু' মাসে বিগড়ি হাঁসের পেছনে বেশ কিছু গচ্চা দিয়ে নিজেও জব্দ হয়ে গেল, আমাদেরও মেরে গেল। আপনি মরিলি তুই মজালি লঙ্কায়। এই আর কি!

গায়ের জোরে না মারুক, যাবার সময় বাপি দত্ত যে-সব বাক্যবাণ ছেড়ে গেছে, নেহাত গণ্ডারের চামড়া না হ'লে আমরা তা'তেই কাবু হতাম। বাপি দত্ত রোজকার মত মিউনিসিপ্যাল মার্কেট থেকে হাঁস কিনে এনে নিজেই সেদিন যথারীতি কাটতে বসেছে। ধৈর্য তার অসীম সন্দেহ নেই। দু' মাস ধরে হাঁস কেটে নাড়িভুঁড়ি ছাড়া কিছু না পেয়েও সে দমেনি। ঘনাদার সেই সাত-রাজার-ধন মানিকের কৌটো কোন্ হাঁসের পেট থেকে বেরিয়ে হঠাৎ একদিন তাকে রাজা করে দেবে, এ বিশ্বাস নিয়েই সে রোজ হাঁস কাটতে বসে।

অন্যদিন আমরা কাছাকাছি ঘোরাফেরা করে ঠাট্টা বিদ্রূপ মাঝে মাঝে করি।

"কি হে দত্ত! পেলে কৌটো?" "বিগড়ি হাঁস ছেড়ে এবার পাতিহাঁস ধরো হে!"—ইত্যাদি।

এদিন কিন্তু আমরা, বাপি দত্ত হাঁস কাটতে বসার পরই যে যেখানে পারি গা-ঢাকা দিয়েছিলাম।

হঠাৎ বাপি দত্তের বাজখাঁই গলার চীৎকারে মেস কম্পমান!

"ইউরেকা! পেয়েছি! পেয়েছি!"

আমরা যে-যার জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে দোতলার বারান্দা থেকে সবিস্ময়ে নিচে উঁকি দিয়েছি এবার! ঘনাদা পর্যন্ত তাঁর তেতলার ঘর থেকে নেমে এসে বারান্দা দিয়ে গলা বাড়িয়েছেন।

বাপি দত্ত নিচের উঠোন থেকে কি একটা জিনিস রক্ত-মাখা

হাতে তুলে ধরে শুধু বুঝি ধেই-নৃত্য করতে বাকি রেখেছে,—"শীগ্‌গির শীগ্‌গির আস্থন! মার দিয়া কেল্লা!"

আমরা শশব্যস্ত হয়ে নিচে নেমে গেছি—ঘনাদাকেও একরকম টানতে টানতে সঙ্গে নিয়ে।

নিচে নামবার পর বাপি দত্তের গলায় যত উত্তেজনা, আমাদের মুখে তত বিমূঢ় বিস্ময়!

বলেছি,—"এঁ্যা। সেই কৌটো! সেই বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা যাতে কেনা যায় সেই ভারী জলের হ্রদের ম্যাপ?"

আড়-চোখে ঘনাদার মুখটাও দেখে নিয়েছি তার মধ্যে। কিন্তু 'কেমন, কি বলেছিলাম!' ভাবখানার বদলে তাঁকে যেন কেমন ভ্যাবাচ্যাকাই দেখিয়েছে।

বাপি দত্তের সেদিকে লক্ষ্য নেই। কৌটোটা ঘনাদাকে সগর্বে দেখিয়ে সে হাঁপাতে হাঁপাতে হাঁসের পেট কেটে সেটা বার করার কাহিনী সবিস্তারে শুরু করেছে।

শিবু একটু কেশে বাধা দিয়ে বলেছে,—"কিন্তু কৌটোটা এবার খুললে হ'ত না!"

শিশির গম্ভীর মুখে সায় দিয়ে বলেছে,—"তবে খোলবার সম্মানটা ঘনাদারই পাওয়া উচিত!"

বাপি দত্ত সোৎসাহে বলেছে, "নিশ্চয়! নিশ্চয়! ঘনাদা ছাড়া খুলবে কে?" কৌটোটা সে ঘনাদার দিকে এগিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু ঘনাদার হঠাৎ হ'ল কি? এতবড় জয়-গৌরবের মুহূর্তে যেন সরে পড়তে পারলে বাঁচেন!

"না, না, আমার কি দরকার! ও তোমরাই খোলো!" ব'লে তিনি সটান সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়েছেন। কিন্তু বাপি দত্তই তাঁকে আটকেছে। আনন্দে গদগদ হয়ে বলেছে, "তা কি হয় নাকি! এ আপনারই কৌটো, আপনাকেই খুলতে হবে।"

অগত্যা ঘনাদাকে বাধ্য হয়ে কৌটোটা খুলতে হয়েছে। আমরা সকলে তখন উদ্‌গ্রীব হয়ে তাঁকে চারধারে ঘিরে দাঁড়িয়েছি। বাপি দত্তর চোখ দুটো প্রায় কোটর ঠেলে বুঝি বেরিয়েই আসে!

কৌটোর ভেতর থেকে এক টুকরো কাগজ বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসের যে চীৎকার উঠেছে, তা প্রায় মোহনবাগান কি ইস্ট বেঙ্গলের শেষ মিনিটে গোল দিয়ে জিতে যাবার সামিল।

বাপি দত্ত আর ধৈর্য ধরতে পারেনি। ঘনাদার হাত থেকে কাগজের পাকানো টুকরোটা নিজের অজান্তেই ছিনিয়ে নিয়ে খুলে ফেলেছে।

তারপর তার মুখে পর পর যে ভাবান্তর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দেখা গেছে, ছায়াছবিতে হ'লে হাততালি পেত নিশ্চয়।

প্রথমে আহ্লাদে আটখানা, তারপরে চমকে হতভম্ব, তারপর একেবারে কালবোশেখীর কালো মেঘ।

সেই কালবোশেখীর মেঘই গর্জে উঠেছে এবার,—"কার, কার এই শয়তানি?"

গৌর বোকা সেজে বাপি দত্তের হাত থেকে কাগজের টুকরোটা নিয়ে পড়ে শুনিয়েছে ভালমানুষের মত।

কাগজের টুকরোতে গোটা গোটা করে ছাপার হরপের মত লেখা,—"ঘনাদার গুল!"

তারপর যে লঙ্কাকাণ্ড হয়েছে তার পরিণামেই বাপি দত্ত মেস ছেড়েছে, আর ঘনাদা ছেড়েছেন আমাদের।

বিকেল বেলা। ঘনাদার রুটিন আমাদের জানা। এতক্ষণ তিনি দুপুরের দিবানিদ্রা সেরে, গড়গড়ায় পরিপাটি করে তামাকটি সেজে, পরমানন্দে খাটের ওপর বালিশ হেলান দিয়ে বসে তা' উপভোগ করছেন। এই গড়গড়ায় তামাক খাওয়াটা ইদানীং শুরু হয়েছে, আমাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের পর।

হঠাৎ নিচে সোরগোল উঠল। গৌর গলা চড়িয়ে শিশিরকে বকছে,—"আচ্ছা, তুই পিয়নকে ফেরত দিলি কি বলে!"

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গলা। শিশিরকে সবাই মিলে আমরা কোণঠাসা করছি চেঁচিয়ে।

"আহা! একবার জিজ্ঞেস করে দেখা ত' উচিত ছিল।"

"একেবারে 'হিঁয়া নেহি' বলে বিদেয় করবার কি দরকার ছিল?"

"ঘনাদার নাম যখন বললে, তখন তাঁকে একবার ডাকতে ক্ষতি কি ছিল?"

শিশির যেন সকলের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে রেগে জবাব দিলে—"ডেকে লাভ কি! ঘনাদা কি ঘর থেকে বেরুতেন! আর রেজেস্ট্রী-চিঠি ঘনাদার নামে কোত্থেকে আসবে?"

কয়েক সেকেণ্ড বিরতির মধ্যে টের পেয়েছি ওপরে গড়গড়ার 'ভুড়ুক ভুড়ুক' আওয়াজ থেমে গিয়েছে।

দরজার খিলটা সাবধানে খোলার আওয়াজ যেন পাওয়া গেল। আমরাও গলা চড়িয়ে দিলাম।

"রেজেস্ট্রী-করা চিঠি কেউ ফেরত দেয়? তার ওপর আবার ইনসিওর-করা!" ওই 'ইনসিওর' শব্দটিতে বাজিমাত হয়ে গেল।

একটা গলাখাঁকরির আওয়াজে আমরা যেন চমকে চোখ তুলে তাকালাম। ঘনাদা ছাদের আলসের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন ঘর থেকে বেরিয়ে।

"এই যে ঘনাদা! শুনেছেন শিশিরের আহাম্মুকি!"

"সেইটেই শুনতে চাইছি।"

আর ছু'বার বলতে হ'ল না। তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে সবাই ওপরের ছাদে গিয়ে হাজির। তারপর এর মুখের কথা ও কেড়ে নিয়ে সবিস্তারে ফলাও করে ব্যাপারটা জানান হ'ল। সেই সঙ্গে শিশিরকে গালমন্দ আর আমাদের থেকে থেকে আফসোস!

"ঈস্, ইনসিওর-করা চিঠি—! কি ছিল তা'তে কে জানে!"

"কিন্তু পোস্টাফিসে গেলে এখনো ত' সে চিঠি পাওয়া যায়!"—ঘনাদা নিজেই পথ খুঁজে বার করলে আগ্রহের সঙ্গে।

আমরা তার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম।

"আর কি করে পাওয়া যাবে! কালই নাকি শেষ তারিখ ছিল চিঠি দেবার! আজ একবার শুধু শেষ-চেষ্টা করবার জন্যে এনেছিল। পিওন বলে গেল আজ ছুপুরেই চিঠি যেখান থেকে এসেছে সেখানে ফেরত যাবে।"

শিশিরকেই আমরা ধমকালাম,—"ফেরত যাবে মানে! এতদিন কি করছিল! রেজেস্ট্রী-চিঠি এতদিন দেয়নি কেন?"

"নামের একটু গোলমাল ছিল যে! নাম ছিল Gana Sam Dos, তা'তেই পোস্টাফিস ঠিক বুঝতে পারেনি এতদিন!"—শিশির ব্যাপারটাকে আরও ঘোরালো করে তুললে।

আমরা শিশিরের ওপরেই চটে উঠলাম,—"বুঝতে পারেনি বললেই হ'ল! নামে গোলমাল থাক, ঠিকানা ত' ছিল, আর বিদেশের চিঠিতে নামের বানান ত' কতরকম হ'তে পারে। ঘনাদার কি শুধু ইংরেজদের সঙ্গেই কারবার! জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান —কার সঙ্গে নয়?"

"না দোষ কিন্তু শিশিরের!"—শেষপর্যন্ত আমরা শিশিরের ওপরেই গিয়ে পড়লাম,—"চিঠিটা ও কি ব'লে ফেরত দিলে?"

"খুব অন্যায় হয়েছে আমার।"—অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে শিশির যেন সিগারেটের টিনটা খুলে ধরল।

ঘনাদা অন্যমনস্কভাবে তা থেকে একটা তুলে নিতেই আর আমাদের পায় কে?

"চিঠিটা কোন জার্মানের লেখা বোধ হয়।" শিবুই জল্পনা শুরু করে দিলে সোৎসাহে,—"ঘনাদাকে সেখানে 'হের ডস্' নামেই ত' সবাই চেনে।"

গৌর প্রতিবাদ জানালে,—"না, না, নিশ্চয়ই ফরাসী কেউ লিখেছে। কি শিশির,—নামের আগে মঁসিয়ে ছিল না?"

"মঁসিয়ে নয়, সেনর বলে মনে হচ্ছে। ইটালী থেকে কেউ লিখেছে বোধ হয়। তাই না?" প্রশ্নটা শিশিরকেই করলাম।

শিশির অপরাধীর মতই স্বীকার করলে চিঠির নামের আগে কি লেখা ছিল সে লক্ষ্যই করেনি।

"তা লক্ষ্য করবে কেন? তা' হ'লে যে কাজ হ'ত!" ব'লে শিশিরকে ধমকে গৌর সোজা ঘনাদাকেই প্রশ্ন করলে,—"চিঠিটা কোথা থেকে কে পাঠিয়েছিল কিছু বুঝতে পারছেন?"

কয়েকটা উৎকণ্ঠিত মুহূর্ত। পাল্লা কোন্‌দিকে হেলবে? সন্ধি না বিগ্রহ?

শিবু হঠাৎ পাল্লায় পাষাণ চড়িয়ে দিলে আলসে থেকে ঝুঁকে ঠাকুরকে চীৎকার ক'রে ডেকে,—"আমাদের কবিরাজী কাটলেটগুলো আর চা, ওপরেই নিয়ে এসো ঠাকুর।"—ঘনাদার দিকে ফিরে সলজ্জভাবে বিশদ বিবরণও দিয়ে দিলে,—"স্পেশাল অর্ডার দিয়ে আনিয়েছি আজ।"

ওই পাষাণটুকুতেই পাল্লা হেললো। কাটলেটের কথা যেন শুনতেই পাননি এইভাবে ঘনাদা আগেকার প্রশ্নটাকেই তুলে ধরলেন,—"চিঠিটা কোথা থেকে কে পাঠিয়েছে জানতে চাও, কেমন?"

আমরা ঘনাদার আগেই তাঁর ঘরেব দিকে পা বাড়িয়ে বললাম,—"হ্যাঁ, হঠাৎ বিদেশ থেকে ইনসিওর-করা চিঠি!"

ততক্ষণে ঘনাদার ঘরে আমরা ঢুকে পড়েছি। নিচে থেকে বড় ট্রেতে করে চা আর কাটলেটের ডিসও এসে গেছে।

ঘনাদা তাঁর তক্তাপোশটিতে সমাসীন হয়ে অন্যমনস্কভাবে একটা কাটলেট তুলে নিয়ে বললেন,—"চিঠিটা হঠাৎ নয় হে, এই চিঠি···"

কথাটা আর শেষ করা তাঁর হ'ল না। পরপর চারটি স্পেশাল অর্ডার-দেওয়া কবিরাজী কাটলেট যথাস্থানে প্রেরিত না হওয়া পর্যন্ত কথাটার সঙ্গে আমরাও মাঝপথেই ঝুলে রইলাম।

কাটলেটের পর ডান হাতের তর্জনী ও অনামিকার মধ্যে শিশিরের মুখ গুঁজে দিয়ে জ্বালিয়ে-দেওয়া সিগারেটটিতে দু'বার সুখটান দিয়ে চায়ে চুমুক দিতে দিতে তিনি বাক্যাংশটি শেষ করলেন।

"···অনেকদিন আগেই আসার কথা।"

"তাহ'লে কে পাঠিয়েছে বুঝতে পেরেছেন !"—আমরা যেন অবাক্ !

"তা আর বুঝিনি ! ওই নামের বানান দেখেই বুঝেছি। আমার নামের ও বানান শুধু একজনেরই করা সম্ভব। আজ দু'বছর ধ'রে তার এই চিঠির জন্যেই দিন গুনছি !"

"দু' বছর ধ'রে ! খুব দামী চিঠি নিশ্চয় ?"—শিশির চোখ বড়-বড় করে জিজ্ঞাসা করলে।

ধমকে বললাম,—"দামী না হ'লে ইনসিওর করে !"

ঘনাদা কিন্তু একটু বিদ্রূপের হাসি হাসলেন,—"ইনসিওর ত' নামে, নইলে ও-চিঠি ইনসিওর করার খরচা দিতে পেরুর ট্রেজারি ফতুর হ'য়ে যেত !"

এবার নির্ভাবনা হয়ে কপালে চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করলাম,—"চিঠিটার এত দাম ?"

"কি ছিল ওতে ? হীরে মুক্তো ?" সরলতার প্রতিমূর্তি হয়ে জিজ্ঞাসা করলে শিবু।

"দূর ! হীরে-টিরে হ'লে ত' ভারী হ'ত। আর হীরের দাম

যতই হোক, ইনসিওর করবার খরচ দিতে ট্রেজারী ফতুর হয় নাকি ?"—শিশির শিবুর মূঢ়তায় বিরক্ত হয়ে উঠল।

"কিন্তু পেরুর ট্রেজারি কেন ?" গৌর একেবারে সার কথাটা ধরে বসল,—"চিঠিটা পেরু থেকে এসেছিল নাকি ?"

ঘনাদা একটু হেসে আমাদের উদ্‌গ্রীব মুখগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে বললেন,—"হাঁ, পেরুর কুজ্‌কো শহর থেকে ডন বেনিটো ছাড়া আর কেউ ও-চিঠি পাঠাতে পারে না।"

"কিন্তু কি ছিল ওতে ?"—আমরা উদ্‌গ্রীব।

আমাদের যথারীতি কয়েক সেকেণ্ড রুদ্ধ-নিশ্বাসে অপেক্ষা করিয়ে রেখে ঘনাদা ধীরে ধীরে বললেন,—"ছিল ক'টা রঙীন সুতো।"

"সুতো !" আমরা এবার সত্যিই হতভম্ব।

"সুতো মানে এই কাপাসের তুলো থেকে যে সুতো পাকানো হয় ?"—শিবুর মুখের হাঁ আর বুজতে চায় না।

"হ্যাঁ, গাঁটপড়া রঙীন খানিকটা সাধারণ সুতলি !"—ঘনাদা আমাদের দিকে সকৌতুক অনুকম্পার সঙ্গে তাকিয়ে বললেন,—"ওই সুতোর জট ক'টা পেলে, আমেরিকা এ-পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে যেখানে যত ধার দিয়েছে, সব শোধ করে দেওয়া যায়। শুধু ওই গাঁটপড়া সুতলি ক'টার জন্যে গত সওয়া চারশ' বছরে, সওয়া চার হাজার মানুষ অন্ততঃ প্রাণ দিয়েছে !"

আমাদের এবার আর অবাক হবার ভান করতে হ'ল না। গৌর শুধু ধরা-গলায় কোনরকমে জিজ্ঞাসা করলে,—"তা ওই সর্বনাশা সুতো আপনার কাছে পাঠাবার মানে ?"

"মানে ? মানে কিংকাজুর ডাক। কিংকাজু একরকম ভাম। মরণ নিশ্চিত জেনেও তার ডাক সেদিন চিনতে না পারলে এ-গল্প শুনতে পেতে না। তবে—" ঘনাদা একটু হাসলেন।—"মানে ভাল ক'রে বুঝতে হ'লে বারো বছর আগের ব্রেজিলের 'মাত্তো গ্রসসো'-র এমন একটি জঙ্গলে যেতে হয়, কোন সভ্য-মানুষ যেখান থেকে জীবন্ত কখনো ফিরে আসেনি।"

"সেই ভরসায় আপনি বুঝি সেখানে গেছলেন।" ছুম্ করে কথাটা ব'লে ফেলে শিশির একেবারে কূলের কাছে ভরাডুবি প্রায় করেছিল আর কি!

কিন্তু কবিরাজী কাট্‌লেটের গুণ অনেক। শিশিরের কথা ঘনাদার যেন কানেই গেল না।

সিগারেটে একটা মোক্ষম টান দিয়ে তিনি নিজের কথাতেই মশগুল হ'য়ে শুরু করলেন,—"পাঁচটি প্রাণী আমরা প্রাণ হাতে নিয়ে সেই জঙ্গল দিয়ে চলেছি পৃথিবীর সবচেয়ে রহস্যময় একটি জাতির সন্ধানে। তাদের নাম শাভান্তে। ব্রেজিলের দুর্গমতম যে জঙ্গলে তারা থাকে, সেখানে পৌঁছতে হ'লে, জলে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সাপ আনাকোণ্ডা আর কুমীর, আর রক্তখেকো পির্‌হানা মাছের ঝাঁকের হাত থেকে বাঁচতে হয়, আর দুর্ভেদ্য জঙ্গলের পথে যুঝতে হয় বাঘের বড়মাসি জাগুয়ার থেকে শুরু করে বিষাক্ত সাপ, বিছে পর্যন্ত অনেক কিছুর সঙ্গে।

এসব বিপদের হাত এড়ালেই নিস্তার নেই। শাভান্তেরা দুনিয়ার সেরা ঠ্যাঙাড়ে। তীরধনুক তাদের আছে কিন্তু গাঁটওয়ালা মোটা মোটা লাঠি দিয়ে মানুষ মারতেই তাদের আনন্দ। জঙ্গলে কোথায় যে তারা ওত পেতে আছে, কিছুই বোঝবার উপায় নেই। প্রতিপদে কুড়ুল দিয়ে গাছ, লতা-পাতা কেটে যেখানে এগুতে হয়, সেখানে বনের জানোয়ারের চেয়েও নিঃশব্দ-গতি শাভান্তেদের হদিশ পাওয়া অসম্ভব।

শাভান্তেদের চাক্ষুষ দেখে ফিরে এসে বিবরণ দেবার সৌভাগ্য এ-পর্যন্ত কোন সভ্য পর্যটক কি শিকারীর হয়নি। এ অঞ্চলের অন্য অধিবাসীরাও তাদের যমের মত ভয় করে এড়িয়ে চলে। তবু তাদের কিংবদন্তী থেকেই শাভান্তেদের সম্বন্ধে সামান্য যা-কিছু বিবরণ এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে।

সেবার কিন্তু ঠিক বিজ্ঞানের খাতিরে শাভান্তেদের রাজ্যে ঢুকিনি। ওই অঞ্চলে দু'বছর আগে সেনর বেরিয়েন নামে একজন

পর্যটক নিরুদ্দেশ হয়ে যান। তাঁকে খুঁজতে পরের বছর আর একদল নিয়ে ডন বেনিটো নামে একজন বিখ্যাত শিকারীও ওই অঞ্চলে গিয়ে আর ফেরেননি। ব্রেজিল সরকারের পক্ষ থেকে এই দু'জনের খোঁজ পাবার জন্যে বিরাট এক পুরস্কার তখন ঘোষণা করা হয়েছে। কতকটা সেই পুরস্কারের লোভে, কতকটা অন্য এক মতলবে ছোট একটা দল নিয়ে সেই অজানা অঞ্চলে পাড়ি দিয়েছিলাম।

দলে পাঁচটি প্রাণী। তিনজন মোট বইবার কুলি বাদে আমি আর রেমণ্ডো। রেমণ্ডো আধা-পর্টুগীজ, একজন ও-দেশী শিকারী। ঠিক শাভান্তেদের রাজ্যে কখনো না গেলেও আশেপাশের অঞ্চলটা তার কিছু জানা ছিল ব'লে তাকেই পথ দেখাতে এনেছিলাম।

জানা-এলাকা ছেড়ে অজানা মুল্লুকে ঢোকবার পরই কিন্তু বুঝেছিলাম আমি যদি কানা হই, ত' সে চোখে দেখে না, এই অবস্থা!

রোন্থরো নদীর তীরে দাঁড়িয়ে গভীর জঙ্গলের ভেতর ঢুকে তখন আমাদের দিশাহারা অবস্থা। তবু জঙ্গলের মধ্যে সামান্য একটু ফাঁকা জায়গা পেয়ে কুলিদের দিয়ে পরিষ্কার করিয়ে সেদিন রাতে তাঁবু ফেলেছি। পালা ক'রে আমি ও রেমণ্ডো পাহারায় থাকব এই ঠিক হয়েছে। প্রথম রাতটা পাহারা দিয়ে সবে তাঁবুর মধ্যে দু'চোখের পাতা একটু এক করেছি, এমন সময় রেমণ্ডোর ঠেলায় ধড়মড় ক'রে উঠে বসতে হ'ল।

'শুনতে পাচ্ছেন আমো!' রেমণ্ডো কাঁপতে কাঁপতে বললে।

'কি, শুনবো কি!' বিরক্ত হয়ে বললাম,—'ও ত' জংলী মাকাও কাকাতুয়ার ডাক!'

'না আমো, ভাল করে শুনুন!' রেমণ্ডোর গলা দিয়ে ভয়ে কথাই বার হ'তে চাচ্ছে না।

মন দিয়ে এবার শুনলাম এবং সত্যই প্রথমে সমস্ত গায়ে আপনা থেকে কাঁটা দিয়ে উঠল।

মাকাওর কর্কশ ডাকের পরই ব্রেজিলের লাল বাঁদর গুয়ারি-

বাস-এর বুক কাঁপানো চীৎকার। তারপর সেটা থামতে না থামতেই ময়ূর জাতের পাভাস পাখির গলার ঝনঝনে ঝংকার।

রেমণ্ডোর দিকে চেয়ে দেখি সে ইতিমধ্যে ঘামতে শুরু করেছে।

এ-অবস্থায় ঘেমে ওঠা কিছু আশ্চর্যও নয়। পাভাস পাখির ডাক বন্ধ হবার পরই জাগুয়ারের গলার ফ্যাঁস-ফ্যাঁস শোনা গেল আর তারপরই আবার গুয়ারিবাস বাঁদরের ডাক।

আওয়াজগুলো ক্রমশঃ কাছেই এগিয়ে আসছে।

'কি হবে আমো!' রেমণ্ডো মাটির ওপরই বসে প'ড়ল। তাকে সাহস দেব কি নিজের অবস্থাই তখন কাহিল। তবু ধমকে বললাম,—'আমো আমো ক'রো না। কতবার বলেছি আমি তোমার মনিব নয় বন্ধু, আমো নয় আমিগো।'

'যে আজ্ঞে আমো।' ব'লে রেমণ্ডো তেমনি কাঁপতে লাগলো।

বিপদের মধ্যেও না হেসে পারলাম না। তারপর আবার ধমক দিয়ে বললাম,—'লজ্জা করে না তোমার? তুমি না ব্রেজিলের সেরা শিকারী!'

'শিকারী হয়ে লাভ কি আমো!'

লাভ যে নেই তা আমিও জানতাম। এটা শাভান্তেদের শত্রু মারবার একটা কায়দা। সারারাত দল বেঁধে শত্রুকে বেড়াজাল দিয়ে ঘিরে এমনি জঙ্গলের নানা জানোয়ারের আওয়াজ করতে করতে তারা এগিয়ে আসে, আবার পিছিয়ে যায়। সারারাত শত্রুর চোখে ঘুম ত' নেই-ই, প্রতি মুহূর্তেই আক্রমণের ভয়ে তটস্থ অবস্থা। এমনি ক'রে সারারাত শত্রুর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিয়ে ভয়ে ভাবনায় আধমরা ক'রে ভোরের দিকে শাভান্তেরা সমস্ত আওয়াজ থামিয়ে একেবারে যেন বিদায় নিয়ে চলে যায়। শত্রু তখন বিপদ কেটেছে মনে ক'রে ক্লান্তিতে হয়তো একটু ঘুমিয়ে পড়ে। শাভান্তেরা ঠিক সেই সময়েই হানা দিয়ে তাদের গেঁটে লগুড় দিয়ে সব সাবাড় ক'রে দেয়। শাভান্তেদের একটি লোকও তাতে মারা পড়ে না। শুধু ফন্দিতেই কাজ হাসিল হয়ে যায়।

বুনো জানোয়ারের ডাক ইতিমধ্যেই পিছিয়ে যেতে শুরু করেছে, টের পেলাম।

রেমণ্ডোকে ও সেই সঙ্গে নিজেকেও সাহস দেবার জন্য বললাম, —'এখনি এত ভেঙে পড়বার কি হয়েছে! ওদের এ চালাকি ত' সারারাত চলবে। ভোরে ওরা চড়াও হবার আগে পালাতে পারলেই হ'ল।'

'কিন্তু পালাবেন কোথায় আমো! আমরা মাত্র পাঁচজন, আর ওরা অন্তত পাঁচশ'। পাঁচজন হ'লেও ওরা এমনিতে রাত্রে আক্রমণ করতে চায় না। কিন্তু পালাবার চেষ্টা করলেই ঠেঙিয়ে শেষ ক'রে দেবে! আমাদের দু'জনের দু'টো বন্দুকে ক'টাকে ঠেকাবেন এই অন্ধকার জঙ্গলে?'

রেমণ্ডোর কথাগুলো মিথ্যে নয়। কি ব'লে আপাততঃ তাকে শান্ত করব ভাবছি, এমন সময় জংলা আওয়াজ আবার কাছে এগুতে শুরু করল। প্রথমে টুকান পাখির চড়া গলা, তারপর জাগুয়ারের জাতভাই কুজার-এর গর্জন আর সে ডাক থামতেই সেই কিংকাজুর ঝগড়াটি বেড়ালের মত ডাক।

এই ডাক শুনেই চম্‌কে উঠে দাঁড়ালাম।

রেমণ্ডো সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে সভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কি হ'ল আমো?'

'এখুনি জানতে পারব।' ব'লে বেরুবার চেষ্টা করতেই রেমণ্ডো দু'হাতে আমায় জড়িয়ে প্রায় ককিয়ে উঠল,—'আপনি কি পাগল হলেন আমো! যাচ্ছেন কোথায়?'

বেশ জোর ক'রেই তার হাত ছাড়িয়ে কোন উত্তর না দিয়ে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়লাম।

ঘুটঘুটে অন্ধকার যাকে বলে। দিনের বেলাতেই যেখানে চলা-ফেরা শক্ত, রাতের অন্ধকারে সে জঙ্গলে এক পা এগুনোই দায়। টর্চ জ্বালবার উপায় নেই বলেই সঙ্গে নিইনি। কোনরকমে হোঁচট খেতে খেতে, হাতড়াতে হাতড়াতে, সেই জঙ্গল ভেদ করে চ'ললাম।

কিংকাজুর ডাকের পর আবার গুয়ারিবাসের চীৎকার হতেই একটা শিস্ দিলাম 'উইরা পুরু' পাখির তীক্ষ্ণ বাঁশির মত আওয়াজ ক'রে।

অন্যদিকের শব্দটা খানিক থেমে গেল তাইতেই।

তার পর ওদিক থেকে আবার মাকাও পাখির ডাক শুরু হতেই 'আন্তা' মানে টাপিরের আওয়াজ শুরু করলাম।

জঙ্গল এবার একেবারে চুপ।

নিজেই আবার প্রেসিঁওর আওয়াজ নকল ক'রে তার ওপর পাভাস পাখির গলার ঝংকার জুড়ে দিলাম।

জঙ্গলে আর কোন শব্দ নেই। আমি কিন্তু যথাসম্ভব সাবধানে তখনও এগিয়ে চলেছি।

বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে যাবার পর জঙ্গল একটু ফাঁকা হ'তে, দেখি যা ভেবেছিলাম তাই—।"

"একটা চিড়িয়াখানা!"—শিবু বোধ হয় আর থাকতে না পেরেই বলে উঠল।

ঘনাদা ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকাতেই আমরা শিবুকে ধমকে উঠলাম, "চিড়িয়াখানা! শিবুর যেমন বুদ্ধি! জঙ্গলে কখনো চিড়িয়াখানা থাকে!"

ঘনাদা খুশী হলেন কিনা বলা যায় না, কিন্তু তাঁর বর্ণনা আবার চলল।

"বনের ওই ফাঁকা জায়গায় একটা তাঁবু। চারদিক ঢাকা হ'লেও তার ভেতর থেকে জোরালো হ্যাসাক বাতির সামান্য আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। নিঃশব্দে সেই তাঁবুর পেছনে গিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে ধেড়ে ইঁদুর কাপিবারার মত আওয়াজ দিলাম।

তাঁবুর ভেতর থেকে বাঘের মত গর্জন শোনা গেল,—'কিয়েন্ এস্তা আহি?'—অর্থাৎ কে ওখানে?

বললাম,—'সয় ইয়ো!' অর্থাৎ আমি।

এবার তাঁবুটাই যেন দুলে উঠলো এবং তার পর্দা সরিয়ে

ছোটখাট পাহাড়ের মত যে লোকটি ক্ষেপে বেরিয়ে এল, অন্ধকারের মধ্যেও শুধু তার আকার দেখেই তাকে আমি তখন চিনে ফেলেছি।

সে বেরিয়ে আসতেই আমি নিঃশব্দে অন্যদিকে সরে গেলাম। টর্চ জ্বেলে সে তাঁবুর চারিদিকে ঘুরে যখন আবার ভেতরে ঢুকল তখন আমি তার জিনিসপত্র যা ঘাঁটবার ঘেঁটে দেখে তারই বিছানায় শুয়ে একটা সিগারেট ধরিয়েছি।

তাঁবুর ভেতর ঢুকে আমায় ওই অবস্থায় দেখে পাহাড় একেবারে আগ্নেয়গিরি হয়ে উঠল।

'তবে রে মুকুরা চিচিকা!' মানে পুঁচকে গন্ধগোকুল ব'লে সে তেড়ে আসতেই উঠে বসে বললাম, 'ধীরে ধুমসো আই, ধীরে!'— আই হ'ল দুনিয়ার সবচেয়ে কুঁড়ের ধাড়ি জানোয়ার ব্রেজিলের 'শ্লথ'।

মাঝপথে থেমে সে একেবারে হতভম্ব হয়ে আমার দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে বললে,—"তুমি ডস্? এখানে! কি দেসিয়া উস্তেদ?"—মানে, কি তুমি চাও?

"বিশেষ কিছু না! সেনর বেরিয়েন-এর সন্ধান করতে যে দলবল নিয়ে বেরিয়েছিল সেই বেনিটোর সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই। সেনর বেরিয়েনের কি হয়েছে, ডন বেনিটোই বা তাঁর খোঁজে বেরিয়ে কেন নিরুদ্দেশ, এ সব খবর জানবার জন্যে পৃথিবীর সবাই একটু উদ্‌গ্রীব কিনা!"

আমার পাশেই সেই চার-মণী লাশ নিয়ে বসে ডন বেনিটো এবার হতাশভাবে বললে,—"সেনর বেরিয়েন শাভান্তেদের হাতে মারা গেছেন!"

'তা ত' বুঝলাম, কিন্তু সে কথা জানবার পর সভ্য সমাজে না ফিরে ডন বেনিটো এই জঙ্গলের মধ্যে এখনো লুকিয়ে থাকতে এত ব্যাকুল কেন?"

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বেনিটো পাল্টা প্রশ্ন ক'রে ব'সল এবার,—"তুমি আমার খোঁজ পেলে কি ক'রে?"

হেসে বললাম,—"তোমার একটু ঠিকে ভুলের দরুন বন্ধু! তুমি মস্ত শিকারী। প্রত্নতত্ত্ব নিয়েও কিছু নাড়াচাড়া করেছ, শুনেছি, কিন্তু প্রাণিবিদ্যাটায় তেমন পাকা ত' নও, তাই শাভান্তেদের সঙ্গে ভাব করবার জন্যে তাদের মত হরবোলার গলা দুরস্ত করলেও একটা মস্ত ভুল ক'রে ফেলেছ!"

"কি ভুল?"—বেনিটো বেশ খাপ্পা।

'ভুল কিংকাজুর ডাক। ওই প্রাণীটি যে ব্রেজিলের, এ অঞ্চলে থাকে না, সেইটি তোমার জানা নেই। সাভান্তেরা ও ডাক জানে

না। ওই ডাক শুনেই বুঝলাম শাভান্তেরা নয়—অন্য কেউ ভয় দেখিয়ে আমাদের তাড়াতে চাইছে।"

বেনিটোর জালার মত মুখখানা তখন দেখবার মত। হতভম্ব ভাবের সঙ্গে আফসোস, বিরক্তি, রাগের সেখানে একটা লড়াই চলেছে।

সে লড়াই শেষ হবার আগেই আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "কিন্তু ব্যাপার কি বল ত'? এই জঙ্গলে কোথায় সভ্য মানুষজন দেখলে খুশি হয়ে দেখা করবে, না, ভয় দেখিয়ে তাদের তাড়াতে চাও?"

"আমি মানে আমি"—বেনিটো আমতা আমতা ক'রে বললে—"সেনর বেরিয়েনকে যখন ফিরিয়ে আনতে পারিনি তখন সভ্য-সমাজে আর মুখ দেখাতে চাই না।"

"বটে!"—গম্ভীরভাবে বললাম,—"তুমি বিফল হবার লজ্জায় এখন অজ্ঞাতবাসই চাইছ তা'হলে? ভালো কথা! কিন্তু আমাকে কি তা'হলে শুধু-হাতে ফিরতে হবে! ওদিকে ব্রেজিল সরকারের পুরস্কারটাও ত' ফসকাচ্ছে।" "কি, কি তুমি চাও!"—বেনিটো আমায় যে-কোন ভাবে তাড়াতে পারলে বাঁচে, বোঝা গেল।

"কি চাই?"—যেন বেশ ভাবনায় পড়ে বললাম,—"এই জঙ্গলে কি-ই বা তোমার আছে যে দেবে?"

"তুমি বলো না, কি চাও। ব্রেজিলের সরকার তোমায় যা পুরস্কার দিত তাই তোমায় যদি দিই, হবে?"—বেনিটো বেশ ব্যাকুল।

"কিন্তু দেবে কি ক'রে! এখানে অত টাকা তুমি পাচ্ছ কোথায়?"

"এখানে নয়, পেরুতে। এখুনি একটা চিঠি তোমায় লিখে দিচ্ছি। তুমি লিমায় গিয়ে যে ঠিকানায় চিঠি দিচ্ছি সেখানে দেখালেই পাবে।"—বেনিটো আমায় রাজী করাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে বললে, "আমার কথা ত' বিশ্বাস করো!"

"খুব করি। কিন্তু অত টাকায় আমার দরকার নেই। তুমি বরং..." ঘরের চারিদিকে একবার চোখ ঘোরালাম।

বেনিটো অধীর হয়ে বললেন,—"হ্যাঁ বলো, বলো কি চাও ?"

"চাই খানিকটা সুতো !" ব'লে ফেলে বোকার মত চেহারা ক'রে তার দিকে তাকালাম।

"সুতো" !—সেই বিরাট জালার মত মুখে মনের ভাব কি সহজে লুকনো যায়। তবু প্রাণপণে ঠাণ্ডা থাকার চেষ্টা ক'রে বেনিটো বললে,—"তুমি কি পাগল হয়ে গেছ নাকি ! সুতো,—সুতো আবার কি ?"

"কি আর, খানিকটা রঙিন সুতো। তাই হ'লেই আমার চলবে।"

"নাঃ তোমার দেখছি সত্যি মাথা খারাপ হয়ে গেছে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে !"—ব'লে বেনিটো খুব জোরে হাসবার চেষ্টা করলে।

"আমার পাগলামিতে তোমার হাসি পাচ্ছে ? তা'হলে আর একটা মজার গল্প বলি শোন। পিজারোর নাম শুনেছ ত' ?"

"পিজারো ? কে পিজারো ?"—বেনিটো তামাশার সুরে বলবার চেষ্টা করলেও, তার চোখ দুটোয় আর তখন হাসির লেশ নাই। ঠাট্টার সুর বজায় রেখে সে তবু বললে,—"আমি ত পিজারো ব'লে একজনকে চিনি,—আমাদের রাস্তা সাফ করত।"

"এ পিজারোও একরকমের ঝাড়ুদার, তবে প্রায় সওয়া চারশ' বছর আগে দক্ষিণ আমেরিকার পেরু সাফ ক'রে দিয়ে গেছে।"

"ও, তুমি 'কংকিসতাদোর' বীর পিজারোর কথা ব'লছ ?"—বেনিটো যেন এতক্ষণে আমার কথা বুঝল,—"স্পেনের হয়ে যিনি পেরু জয় করেছিলেন।"

"হ্যাঁ, বিশ্বাসঘাতকতাকে যদি জয় করা বলো, খুনি আর শয়তানকে যদি বলো বীর !"

খাঁটি ইস্পাহানী না হলেও এ কথাগুলো বেনিটোর খুব মধুর লাগল না, তবু নিজেকে সামলে সে বললে,—"তা—পিজারোর উপর যত খুশি গায়ের ঝাল ঝাড়ো। কিন্তু তার গল্প আমায় কি শোনাবে !"

"শোনই না। হয়ত প্রাণখুলে হাসবার কিছু পাবে। পেরুর রাজাদের নাম যে 'ইংকা' তা তোমায় বলবার দরকার নেই। পেরুর শেষ স্বাধীন ইংকা আতাহুয়ালপা কাজামার্কা শহরে সরল বিশ্বাসে পিজারো আর তার একশ' তিরাশীজন অনুচরকে অভ্যর্থনা করেন। সেই সাদর অভ্যর্থনার প্রতিদানে পিজারো চরম বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে কৌশলে ইংকা আতাহুয়ালপাকে বন্দী করে। মুক্তির দাম হিসেবে ইংকা সোনা-রুপোয় প্রায় কুবেরের ভাণ্ডার পিজারোকে দেন। সে সমস্ত নিয়েও পিজারো ইংকা আতাহুয়ালপাকে নির্মম-ভাবে হত্যা করে। মানুষের ইতিহাসে সেই কলঙ্কিত তারিখ হ'ল ১৫৩৩-এর ২৯শে নভেম্বর।"

এই পর্যন্ত শুনেই বেনিটো ধৈর্য হারিয়ে বললে, "তোমার সব কথা সত্যি নয়, তবু এ ইতিহাস পৃথিবীর কে না জানে!"

"সবাই যা জানে না তাই একটু তাহলে বলি। পেরুর শেষ ইংকার কাছ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা করে পিজারো সোনাদানা যা নিয়েছিল, তা বিরাট দীঘির একটা গণ্ডূষ মাত্র। পেরু তখন সোনায় মোড়া বললেও বেশী বলা হয় না। ইংকারা নিজেদের সূর্যের সন্তান বলত, আর সোনাকে বলত সূর্যের চোখের জল। সোনায় তারা থালাবাটি ঘটি গয়না থেকে বড় বড় মূর্তিই শুধু তৈরি করতো না, তাদের মন্দিরের মেঝেও হতো সোনা দিয়ে বাঁধানো। কুজ্‌কো শহরের সূর্যমন্দিরের চারিধারে বর্ষার জলের নর্দমাগুলোও ছিল সোনার পাত নয়, তাল দিয়ে তৈরি। আর রুপো তো তখন এমন সস্তা যে কংকিস্তাদোর মানে পিজারোর বিজয়ী সৈনিকেরা তাই দিয়ে ঘোড়ার নাল বাঁধাত। পিজারো সোনার লোভে ইংকাকে আগেই মেরে না ফেললে আরো কত সম্পদ যে পেত কেউ ধারণাই করতে পারে না। কারণ কুজ্‌কো শহর থেকে ইংকা পুরোহিতেরা আতাহুয়ালপার মুক্তির জন্যে আরো রাশি রাশি সোনার জিনিস তখন কাজামার্কাতে পাঠাবার আয়োজন করছে। ইংকার হত্যার খবর পাবার পরই তারা পিজারোর আসল স্বরূপ বুঝে সে সোনাদানা

সব লুকিয়ে ফেলে। কুজ্‌কো শহরই সোনার খনি জেনে পিজারো সে শহর লুণ্ঠন করেও তারপর আসল গুপ্ত ভাণ্ডারের সন্ধানই পায়নি। প্রধান ইংকা পুরোহিত ভিল্লাক উমু সেই সমস্ত গুপ্ত ভাণ্ডারের এমন ভাবে হদিস রেখে দেন, ইস্পাহানীদের পেরু থেকে তাড়াবার পর যাতে সেগুলো উদ্ধার করা যায়। ইংকাদের কোন লিখিত ভাষা ছিল না। তাঁরা যে ভাষায় কথা কইতেন তার নাম 'কেচুয়া'। প্রধান পুরোহিত তাঁর সংকেত-চিহ্ন তাই ভাষার অক্ষরে লিখে যান নি। তিনি সংকেতগুলি যাতে রেখে গিয়েছিলেন তাকে বলে 'কিপু'।

বেনিটো কি কষ্টে যে স্থির হয়ে আছে বুঝতে পারছিলাম। সে এখন হাল্কা সুরে বলবার চেষ্টা করলে,—"তোমার ও কিপুমিপু শুনে হাসি ত' আমার পাচ্ছে না!"

"পাচ্ছে না? তা'হলে আর একটু শোনো। প্রধান পুরোহিতের পর এই সব 'কিপু' দ্বিতীয় পুরোহিতের হাতেই পড়ে। তারপর পুরোহিতবংশই শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে, সে-সব 'কিপু' কোথায় যে হারিয়ে যায় কেউ জানে না। শেষ ইংকা আতাহুয়ালপার এক ভাইপো গার্সিলাসো ছ লা ভেগা সারাজীবন সে-সব 'কিপু' খুঁজেছেন কিন্তু পান নি। শুধু সম্প্রতি এখান ওখান থেকে কয়েকটা টুকরো 'কিপু' উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু মুশকিলের কথা এই যে, 'কিপু'র সংকেত-চিহ্ন পড়বার লোক পৃথিবীতে প্রায় নেই বললেই হয়।"

বেনিটোর ধৈর্যের বাঁধ আর রইল না। রাগে উত্তেজনায় সে গর্জন করে উঠল এবার—"কি, তুমি বলতে চাও কি? এ গল্প আমায় শোনাবার মানে?"

"মানে এই, পৃথিবীর যে দু'তিনটি মাত্র লোক এখনো 'কিপু'র সংকেত-চিহ্ন বুঝতে পারেন সেনর বেরিয়েন তাঁদের একজন। তাঁর শরীরে ইংকাদের রক্তও কিছু আছে। সারাজীবন শুধু পেরুতে নয়, কলম্বিয়ায়, ইকোয়েডরে, চিলিতে, বলিভিয়ায় ও ব্রেজিলে তিনি

হারানো 'কিপু' সন্ধান করে বেড়িয়েছেন। সংগ্রহও করেছেন কিছু। তাঁর শেষ সন্ধান এই মাত্তো গ্রস্‌সোর জঙ্গলে। পেরু স্পেনের কবলে যাবার পর ইংকাদের একটি শাখা টিটিকাকা হ্রদ পেরিয়ে প্রথমে বলিভিয়ায় ও পরে সেখান থেকে ব্রেজিলের এই অংশে এসে রাজ্য গড়বার চেষ্টা করে বলে কিংবদন্তী আছে। কুজ্‌কোর গুপ্ত ভাণ্ডারের সংকেত দেওয়া সবচেয়ে দামী 'কিপু' নাকি এই ইংকারাই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। সেনর বেরিয়েন এই 'কিপু'র খোঁজেই এই দুর্গম জঙ্গলে এসেছিলেন। এবং আমি নিশ্চিত জানি যে তা তিনি পেয়েও ছিলেন।"

"তুমি নিশ্চিত জানো"—বেনিটো একেবারে মারমূর্তি,—"হাত গুনে নাকি ?" একটু হেসে হাতের মুঠোটা তার সামনে খুলে ধরে বললাম—"হাত গুনে নয়, হাতের মুঠোয় ধরে।—"

আমার হাতের দিকে চেয়ে বেনিটোর জালার মত মুখের ভাঁটার মত চোখ দুটো প্রায় ঠেলে বেরিয়ে আসে আর কি ?

তার এই অবস্থা যেন দেখেও না দেখে নিতান্ত ভালো মানুষের মত বললাম,—"এই জন্যেই তোমার কাছে একটু রঙিন সুতো মানে এই 'কিপু' চাইছিলাম। এইটে পেলেই খুশি মনে আমি চলে যাই, তুমিও পরমানন্দে জঙ্গলে অজ্ঞাত বাস করো।"

এতক্ষণে সেই মাংসের পাহাড় সত্যিই আগ্নেয়গিরি হয়ে উঠল।

"তবে রে কালা নেংটি 'কুটিয়া' ! বোড়ার রাজা আনাকোণ্ডার গর্তে এসেছ চুরি করতে !"—বলে সেই চার-মণী লাশ আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একটু গা-ঝাড়া দিয়ে দেখি —

"তাঁবুর কাপড় ছিঁড়ে সেই মাংসের পাহাড় বাইরে ছিটকে পড়ে খাবি খাচ্ছে"—গৌরই ঘনাদার কথাগুলো জুগিয়ে দেবার চেষ্টা করলে।

ঘনাদা একটু ভুরু কুঁচকে বলে চললেন,—"না, দেখি আমিই তাঁবুর কোণে দড়ি-দড়ার মধ্যে থুবড়ে পড়েছি। গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠবার পর বেনিটোর সে কি গর্বের হাসি, তারি সঙ্গে আবার

কাটাঘায়ে নুনের ছিটের মত জ্বালা-ধরানো কথার চিমটি।—"কি ডস্! প্যাঁচটা লাগল কেমন? বড় জব্দ করেছিলে আর বারে, তাই হরবোলা গলা সাধার সঙ্গে যুযুৎসুটাও শিখেছি।"

তার হাসি থামাতে নিজেই এবার ঝাঁপিয়ে পড়লাম তার ওপর। কিন্তু আবার মাটি নিয়ে তার বিদ্রূপ শুনতে হল,—"জাপানী কুস্তি 'সুমো'ও শিখতে ভুলি নি বন্ধু।"

তার হাসি কিন্তু মাঝপথেই গেল বন্ধ হয়ে। মাটিতে পড়ে তখন সে গোঙাচ্ছে। গলাটায় আর একটু চাপ দিয়ে বললাম—"সবই শিখেছ, শুধু এই বাংলা কাঁচিটাই শেখোনি। এখন বলো এ 'কিপু' কোথায় তুমি পেয়েছ? সেনর বেরিয়েনকে খোঁজার নাম করে এসে তাঁকে কোন ছলে মেরে এ 'কিপু' বাগিয়েছ—কেমন?"

জবাবে তার মুখ থেকে একটু কাতরানির মত আওয়াজ বেরুল মাত্র,—"না, না।"

পায়ের ফাঁস একটু আলগা করতেই বেনিটো ককিয়ে উঠল,—"হলফ করে বলছি, সেনর বেরিয়েন মারা যাবার আগে এ 'কিপু' আমায় দিয়ে গেছেন। তাঁর নিজের হাতে লেখা প্রমাণ আমি দেখাচ্ছি।"

তাকে ছেড়ে দিয়ে বললাম, "বেশ, দেখাও সে প্রমাণ। বাংলা কাঁচি দেখেছ, কোন চালাকি করবার চেষ্টা করেছ কি একেবারে বাংলা তুড়ুম ঠুকে দেব।"

মানে বুঝুক আর না বুঝুক, চালাকি করবার উৎসাহ আর তখন বেনিটোর নেই। নিজের ঝোলা থেকে সত্যিই সে একটা আধময়লা চিঠি বার করে দেখালে। সেনর বেরিয়েনের হাতের লেখা আমার চেনা। দেখলাম তিনি সত্যিই তাঁর মৃত্যু-শয্যায় বেনিটোর সেবার প্রশংসা করে তার হাতে 'কিপু'টা দেওয়ার কথা লিখেছেন।

চিঠিটা তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, " 'কিপু'টা যখন সেনর বেরিয়েন নিজেই তোমায় দিয়েছেন, তোমার তখন সেটা নিয়ে এমন লুকিয়ে থাকার মানে কি!"

বেনিটোর মুখ দেখে মনে হ'ল পারলে মানেটা সে আমার গলা টিপেই বুঝিয়ে দেয়। কিন্তু পরিণাম ভেবেই বোধ হয় নিজেকে সামলে সে চুপ করেই রইল।

হেসে আবার বললাম,—"মানেটা তাহ'লে আমিই বলি। এ 'কিপু' সেনর বেরিয়েন তোমাকে দান করেন নি। নিজের মৃত্যুর পর এটা পেরুর সরকারী মিউজিয়মে পৌঁছে দেবার জন্যে তোমার হাতে দিয়েছিলেন। তুমি এখন এই 'কিপু'র অর্থ নিজে বার করে কুজ্‌কোর গুপ্তধন একলা বাগাতে চাও। এখনি সভ্য-জগতে ফিরে গেলে তোমার গতিবিধি পাছে কেউ সন্দেহ করে, তাই তুমি 'কিপু'র সংকেত-চিহ্ন না বুঝতে পারা পর্যন্ত এই জঙ্গলেই লুকিয়ে থাকার ব্যবস্থা করেছ। আমাদের ভয় দেখিয়ে তাড়াবার চেষ্টাও করেছিলে সেই জন্যে।"

"তাই যদি করে থাকি তাতে দোষ কি! প্রাণের মায়া ছেড়ে এ 'কিপু' আমি সন্ধান করেছি। এ 'কিপু' আজ যখন আমার হাতে এসেছে, তখন সে গুপ্ত ভাণ্ডারের দখল আমি অন্য কাউকে দেব কেন?"

হেসে বললাম,—"কিন্তু গুপ্তধন পাওয়ার আগে এ 'কিপু'র মানে ত বোঝা চাই। এ ত কয়েকটা গেরো দেওয়া রঙিন স্থতোর জট মাত্র! ইংকাদের সাম্রাজ্য যাওয়ার সঙ্গে এই স্থতোর গিঁটের সংকেত-চিহ্ন পড়বার বিদ্যাও প্রায় হারিয়ে গেছে। গুপ্তধনের লোভে তুমি সামান্য যা কিছু শিখেছ তা দিয়ে সারা জীবন চেষ্টা করলেও এর মানে খুঁজে পাবে না। স্থতরাং এ 'কিপু' আমিই নিয়ে যাচ্ছি।"

"না, না!" বেনিটো প্রায় কেঁদে উঠল, "আমায় শুধু দু' বছর সময় দাও। দু' বছরে এ 'কিপু'র মানে যদি না বুঝতে পারি তাহ'লে তোমাকেই এ 'কিপু' আমি পাঠিয়ে দেব।"

ঘনাদা থামলেন।

"তাহ'লে মানে বুঝতে না পেরেই এতদিনে সে স্থতোটা আপনার

কাছে পাঠিয়েছিল! কিন্তু দু' বছর বাদেই পাঠাবে কথা ছিল না?"—শিশির সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে।

"হ্যাঁ, কথা তাই ছিল। কিন্তু আমার ঠিকানা ত' পাওয়া চাই।" ঘনাদা শিশিরের নির্বুদ্ধিতায় যেন একটু বিরক্ত,—"কত মুল্লুক ঘুরে তবে ঠিকানা পেয়েছে কে জানে! দেরি হয়েছে তাইতেই!"

"কিন্তু সুতো সমেত চিঠিটাই যে এখন লোপাট। তাহ'লে উপায়?" শিবু প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, "ও 'কিপু'র মানেও তা'হলে আর জানা যাবে না, গুপ্তধনও উদ্ধার হবে না!"

"গুপ্তধন অনেক আগেই উদ্ধার হয়েছে!"—ঘনাদা আমাদের প্রতি একটু অনুকম্পার হাসি হেসে বললেন,—"আমি কি দু' বছরের পরও ঘুমিয়ে ছিলাম! পেরুর লিমা শহরে 'প্লাজা দস দে মেয়ো'র কাছে সরকারী মিউজিয়ামে গেলেই দেখতে পাবে 'কিপু'-তে যার সংকেত দেওয়া ছিল, সে সমস্ত দুর্লভ সোনার জিনিস একটি আলাদা ঘরে সাজানো।"

"তার মানে?"—গৌর হতভম্ব হয়ে বললে,—"আপনি 'কিপু' পড়তে পারেন! সেই রাতেই তার মানে বুঝে নিয়ে আপনি মুখস্থ করে ফেলেছিলেন!"

ঘনাদা এ প্রশ্নের উত্তর দিতেই যেন ঘৃণা বোধ করে শিশিরের পুরো সিগারেটের টিনটা তুলে নিয়ে পকেটে ফেললেন।

নিচে নেমে শিশিরকে না জিজ্ঞেস করে পারলাম না,—"আচ্ছা ইনসিওর করা চিঠিটা কি আমাদের বানানো, না সত্যি এসেছিল?"

শিশির চিন্তিত মুখে বলল,—"তাই ত' ভাবছি।"